'প্রহেলিকা সিরিজের' ত্রয়স্ত্রিংশ গ্রন্থ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য-কুটীর : ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

কল্যাণীয়

শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রাণাধিকেষু

বাবা

জ্যেষ্ঠ, ১৩৫৫

জলটুঙ্গি—

কাশেম উপরের দড়িতে দিলে টান।

[পৃঃ ৮১

প্রথম পরিচ্ছেদ

পিতা-পুত্র

রিপন কলেজ। থার্ড-ইয়ার ক্লাশ। ড্রামার লেকচার চলেছে। ম্যাকবেথ্‌ সুরু হয়েছে···প্রোফেশর বোঝাচ্ছেন, দীজ্‌ থ্রী উইচেস্‌···এদের ডাইনী বলে' ধরলে চলবে না! রূপক-অর্থে উইচেস্‌ হলো···পৃথিবীতে দুরভিসন্ধির বশে যে-সব অনর্থ ঘটছে···evil forces at work···প্রকৃতির বুকে, সমাজে··· এ-উইচেস্‌ হলো সেই সব evil force-এর পার্শনিফিকেশন্‌স্‌।

বেয়ারা শ্লিপ্‌ নিয়ে এলো। পড়ে প্রোফেশর বললেন—জহরলাল রয়।

সামনেই সেকণ্ড বেঞ্চের একটি ছেলে উঠলো দাঁড়িয়ে··· বললে—ইয়েস্‌ স্যর···

প্রোফেশর চাইলেন তার পানে, বললেন—ইয়োর ফাদার ওয়ান্টস্‌ ইউ ইন্‌ অফিস্‌।

জহর বললে—আমি যেতে পারি স্যর?

—ইয়েস্।

বুকে খানিকটা উদ্বেগ নিয়ে জহর বেরুলো ক্লাশ থেকে।

বাবা? তিনি থাকেন মেহদীপুরে। কলকাতায় হঠাৎ? এমন তো বড় একটা আসেন না। কলকাতায় এলেও তার কলেজে…কলেজ-আওয়ার্শে…লেকচারের মাঝখানে কখনো না! ফার্ষ্ট ইয়ার, সেকণ্ড ইয়ার…দু-দুটো বছর তার রিপন কলেজে কাটলো…বাবা কখনো কলেজে এসে তাকে ডেকে পাঠাননি! নিশ্চয় খুব জরুরি কাজ! কিন্তু কি…কি কাজ?

অফিস-রুমে ঢুকতে হলো না। কামরার বাইরে জহরলালের বাবা চুণীলাল পায়চারি করছিলেন…জহর কাছে এসে ডাকলো—বাবা…

—ও…জহর। দরকারে পড়েই আসতে হলো, বাবা। অনেক কথা আছে…আর সে-কথা এখানে দাঁড়িয়ে হতে পারে না। তোমার ছুটী হবে কখন?

জহর বললে—আজ চারটে পর্য্যন্ত ক্লাশ…

—চারটে! চুণীলাল ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, তারপর মনে-মনে কি যেন হিসাব কষলেন, হিসাব কষে চুণীলাল বললেন—তার মানে, বাসায় ফিরতে ধরো সাড়ে চারটে…তারপর কথাবার্ত্তা …না! বাড়ী যেতে হবে…বেলা সাড়ে তিনটেয় লালগোলা-ঘাট প্যাশেঞ্জার…ঐটেয় করে'। নাহলে রাত্তিরে সেই দশটা নাগাদ কাটিহার-প্যাশেঞ্জারে গেলে পৌঁছুতে যার নাম শেষ-রাত্তির! চারটে, সাড়ে চারটে বেজে যাবে। রাত্তিরটা না-

ঘুমিয়ে কাটবে। উঁহু···বেলা এখন দেড়টা বাজে···ছুটী নিতে পারবে ?

জহরলালের মুখ হলো বিশুষ্ক···বিপদের আশঙ্কায়। সে বললে—পারবো।

—তাহলে তাই করো···এখনি ছুটী নিয়ে বেরিয়ে এসো। তারপর তোমার হোষ্টেলে গিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে নেবে। দশ-পনেরো দিন বাড়ীতে থাকতে হতে পারে। বরাত মন্দ হয় যদি, তাহলে হয়তো আরো বেশী। তুমি এসো, হোষ্টেলে গিয়ে সংক্ষেপে সব বলবো।

যে-উদ্বেগ বুকে নিয়ে ক্লাশ থেকে জহর বেরিয়ে এসেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী উদ্বেগ নিয়ে ক্লাশে ফিরলো।

প্রোফেশর তখন সেক্সপীয়র থেকে পড়ছেন—সো ফাউল্ এ্যাণ্ড ফেয়ার এ ডে আই হ্যাভ্ নট্ সীন্···মানে, রৌদ্র-ঝড় দুই আছে···সান্‌শাইন্ এ্যাণ্ড ষ্টর্ম্ম···অর্থাৎ ম্যাকবেথের মনে ভালোয়-মন্দয় যে দ্বন্দ্ব চলেছে, সেক্সপীয়র তার চমৎকার ইঙ্গিত দেছেন!

জহর এক-মিনিট চুপ করে রইলো।

পাশের সহপাঠী বন্ধু বললে—ব্যাপার কি ?

—বাবার সঙ্গে এখনি যেতে হবে···দেশে।

—সরগাছি ?

—ষ্টেশন সরগাছি···ষ্টেশন থেকে আট-দশ ক্রোশ হবে আমাদের গ্রাম···মেহদীপুর।

—একটা শ্লিপ লিখে পেশ করে দিন্ না—নাহলে ঘণ্টা না বাজা পর্য্যন্ত ওঁর লেকচার থামবে, ভাবেন ?

খাতার কাগজ ছিঁড়ে জহর লিখলো—আমার বাবা আমায় নিতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে বেলা সাড়ে তিনটের ট্রেণে আমার দেশে যাওয়া দরকার—জরুরি কাজ। দয়া করে' যদি আমাকে যাবার অনুমতি ছান, কৃতার্থ হবো, স্যর···

শ্লিপ লিখে তা্‌গ্ বুঝে জহর সে-শ্লিপ পেশ করলো প্রোফেশরের সামনে। প্রোফেশর শ্লিশ পড়লেন, পড়ে বললেন—ইয়েস, ইউ গো···আই মার্ক ইউ প্রেজেণ্ট মাই ফ্রেণ্ড···

জহর বই-খাতা নিয়ে ক্লাশ থেকে বেরুলো। বেরিয়ে···

বাবার সঙ্গে হোষ্টেলে। হ্যারিসন রোড আর মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়ে হোষ্টেল। বাবা বললেন—তুমি এগোও···আমি কিছু খাবার কিনে এখনি আসছি।

খাবার খাবে কি, জহরের উদ্বেগ সীমাহীন হয়ে উঠলো। বাবা ছাড়া দেশের বাড়ীতে নিকট-আত্মীয় বলতে কেউ নেই। মা মারা গেছেন আজ পাঁচ বছর। একটি বোন, বোনের বিবাহ হয়ে গেছে···ভগ্নীপতি বহরমপুর কোর্টে ওকালতি করেন। দেশের বাড়ীতে সে আর বাবা···তাছাড়া মহেশ;

বহুকালের চল্‌তি-সিল্কের কারবারের কর্ম্মচারীরা আছেন··· বিনোদবাবু, বুলাকীলাল, স্থরথবাবুরা। তাদের কারো অসুখ-বিসুখ বা অন্য কোনো-রকম বিপদে বাবা কিন্তু জহরকে নিয়ে যেতে আসবেন কেন ?

কোনো অর্থ সংগ্রহ করতে না পেরে জহরের উদ্বেগের পরিমাণ বেড়ে উঠছিল, এমন সময় বাবা চুণীলাল ফিরে এলেন ; তাঁর হাতে খাবারের চ্যাংড়া।

চুণীলাল বললেন—মুখ-হাত ধুয়েছো ? তাহলে খেয়ে নাও। এতে লুচি আছে···আর আলুর দম, লেডিগেনি আছে। আমিও কিছু খাবো···তারপর বই-পত্তর বেঁধে নাও···নিয়ে ষ্টেশন। দশ-পনেরো দিন তো থাকতেই হবে সেখানে···বেশী দিনও হতে পারে !

জহরের মনে কৌতূহল আর উদ্বেগ···কোনোমতে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে, বাবা ?

—কি হয়েছে !

বাপ চুণীলাল ছেলের কথায় প্রতিধ্বনি তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস তিনি রোধ করতে পারলেন না। নিশ্বাস ফেলে বললেন—তোমাকে জানাবো না ভেবেছিলুম, কিন্তু বিধাতা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ! বলতেই হবে। পরের মুখে এ-সব কথা শোনবার চেয়ে আমার মুখে শোনাই ভালো ! তবে এখন, না, দেশে গিয়ে···ভেবে আমি ঠিক করতে পারছিলুম না ! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করলে, তখন মনে হয় যে-খবর

জানাতেই হবে, তার জন্য দু-চার ঘণ্টা আগু-পেছুতে কিছুই এসে যায় না। তুমি খেতে বসো…আমিও খেতে-খেতে তোমায় বলি।

তাই হলো। চুণীলাল তখন বললেন সংক্ষেপে পারিবারিক কথা। সে যেন বাংলার ইতিহাসের অজানা পরিচ্ছেদের একটা টুকরো! অর্থাৎ…

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার অনুগত এবং বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন বীর মোহনলাল। ফন্দীবাজ ইংরেজের সাহায্যে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর যখন নবাবী মশনদের লোভে সিরাজের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল, আর সে-ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল জগৎ শেঠ, মুন্সী নবকৃষ্ণ, দেওয়ান রামচাঁদের দল, তখন শেষ-মুহূর্ত্তে এ-বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে সিরাজ নির্ভর রেখেছিলেন শুধু মোহনলাল আর মীর মদনের ওপর…কিন্তু কি করবেন তাঁরা? বিশ্বাস-ঘাতক মীরজাফর তখন প্রধান সেনাপতি এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও মীরজাফরের আদেশ-পালন করা ছাড়া মোহনলালের অন্য উপায় ছিল না! তাই যুদ্ধে পরাজয় জেনে সিরাজের এবং দেশের দুর্দ্দশার কথা ভেবে চিন্তাকুল মোহনলাল বাড়ী ফিরে আসেন, এসে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের প্রাণ আর মান বাঁচাবার জন্য চুপিচপি নবদ্বীপে চলে যান। সেখানে দীর্ঘকাল তিনি

বেঁচেছিলেন। তারপর মীরজাফরকে তাড়িয়ে মীরকাশিম যখন বাঙলার নবাবী মশনদে, তখন মোহনলাল এসে মীরকাশিমের সঙ্গে দেখা করেন। মীরকাশিমের অসীম শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস ছিল মোহনলালের উপর। তিনি মোহনলালকে বলেন বাংলার সেনাপতির পদ গ্রহণ করতে। মোহনলাল সসম্মানে নবাবকে বলেন—পণ্ডশ্রম হবে। ইংরেজের ঐ যে ভেদনীতি …লোভ দেখিয়ে একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে খুনোখুনি বাধানো, আর খুনোখুনির শেষে মীমাংসার নাম করে' সোনার তাল নিজের পকেটে তুলে লোহার চাকতি দিয়ে বোকা-বিবাদীদের বিদেয় করা—এ-নীতির বিষে বাংলার বোনেদী ঘরগুলো জীর্ণ হতে বসেছে…নবাবী-আসনের স্থায়িত্বে কারো বিশ্বাস নেই! সকলে ঐ তৃতীয়-দল ইংরেজকে ধরে কিছু হাতিয়ে নিতে চায়। এরা দেশ মানে না…জাত মানে না… ধর্ম্ম, ন্যায়…কিছু মানে না। শুধু পাওনা-গণ্ডার দিকে নজর এবং সে পাওনা-গণ্ডা আদায় করতে দেশ-ভুঁই, বাড়ী-ঘর, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-বন্ধু, ধর্ম্ম সব অবিচল চিত্তে বিসর্জ্জন দিতে পারে। সুতরাং ইংরেজকে তাড়ানো শক্ত। বাঙালীর মনের দুর্ব্বলতা আর দুর্ব্বার লোভের যে পরিচয় ওরা পেয়েছে, তার জোরে বাঙালীকে পুতুলের মতো নাচিয়ে-খেলিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারবে এবং তা করবে ও এই বাঙালীই দেখবেন, ইংরেজের হাতে শুধু বাংলা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষকে তুলে দিতে দেরী করবে না। সুতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধে নবাব

মীরকাশিমের অভিযানে তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি থাকলেও দেশের মাটী ফুঁড়ে যে-বিশ্বাসঘাতকের দল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের চক্রান্ত ভেদ করে দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার আশা মোহনলালের মনে স্থান পায় না। তাছাড়া নবাব সিরাজের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল অস্ত্র ছেড়েছেন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়ে আছেন···এই দুটি কারণে নবাবের এতখানি সম্মান আর অনুগ্রহ নিতে তাঁর ভরসা হয় না!

এই স্পষ্ট কথায় নবাব মনে-মনে যেমন খুশী হলেন, তেমনি প্রমাদ গণলেন। মোহনলালকে তিনি পীড়াপীড়ি করলেন না। শুধু প্রশ্ন করলেন—বহু কাল পরে আপনি মুর্শিদাবাদে এলেন ···নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে?

মোহনলাল জবাব দিলেন—আছে উদ্দেশ্য। মুর্শিদাবাদ পরগণার মেহদীপুরে নবাব সিরাজ আমাকে বাসের জন্য একটি প্রাসাদ দিয়েছিলেন। পলাশীর চক্রান্তের পর স্ত্রী-পুত্রের মান আর প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে প্রাসাদ ছেড়ে আমি নবদ্বীপে বাস করছি···কিন্তু আমার বয়স হয়েছে···প্রাসাদের জলটুঙ্গিতে বহু মণি-রত্ন আর অর্থ আছে···সেগুলো আমি নিয়ে যেতে চাই। বাংলায় অচিরে ইংরেজ করবে তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা···স্বার্থ-লোভী বহু দেশদ্রোহী ওদের সহায় আছে, আপনার ভয়ে এখনো আমার প্রাসাদের ধন-রত্ন লুঠ হয়নি···কিন্তু পরে ইংরেজ একছত্র হয়ে বসলে সে ধন-রত্ন তাদের কবলে যাবে। তাই সে-সব যাতে আমি নিয়ে যেতে পারি, আপনি যদি ব্যবস্থা করে

দেন, এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে আপনার কাছে আমি এসেছি।

নবাব মীরকাশিম জবাব দিলেন—ইংরেজ এখনো একচ্ছত্র হয়ে বসেনি—তার একচ্ছত্র হবার চেষ্টা…আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, রোধ করবো। যতদিন আমি বেঁচে আছি, আপনি দয়া করে' মেহদীপুরে এসে আপনার বাড়ীতে বাস করলে আমি কৃতার্থ হবো। ফৌজের ভার না নিন, আপনার সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করতে পারলে আমার পক্ষে বাংলায় ইংরেজের শক্তি খর্ব্ব করার আশা হয়তো খানিকটা সফল হতে পারে। তাছাড়া আপনি কাছে থাকলে আমি উৎসাহ পাবো…শক্তি পাবো। দয়া করে' আমার এ অনুরোধ রক্ষা করে আমায় কৃতার্থ করুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সিরাজ-সেনাপতি মোহনলাল

মীরকাশিমের অনুরোধে মোহনলাল নবাবী দরবার ছেড়ে যেতে পারলেন না ; তবে মুর্শিদাবাদে রইলেন না। মুর্শিদাবাদ থেকে দশ-পনেরো ক্রোশ দূরে মেহদীপুর—সেই মেহদীপুরে নবাব সিরাজদ্দৌলার দেওয়া যে-প্রাসাদ, সেই প্রাসাদে তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করতে লাগলেন। প্রাসাদের নাম মঞ্জিল। নবাবের দেওয়া নাম। মঞ্জিল প্রথমে তৈরী হয়েছিল সিরাজের ছোট ভাই মেহদীর জন্য, কিন্তু সিরাজের গদি পাবার কিছুকাল পরেই মেহদীর মৃত্যু ঘটে। মেহদীর মৃত্যু হলে প্রাসাদ খালি পড়ে ছিল দু-চার বছর ; তারপর মোহনলালকে সিরাজ এ-প্রাসাদ দান করেন। মোহনলালের হাতে প্রাসাদের সংস্কার হয়—অনেক উন্নতি হয়। যুদ্ধ-বিদ্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও মোহনলালের রুচি ছিল সৌখীন্। কেষ্টনগর থেকে শিল্পী আনিয়ে মঞ্জিলের বাগানে তিনি দেব-দেবীর অনেক মূর্ত্তি স্থাপনা করেন ; দীঘি কাটিয়ে দীঘির বুকে একটি জলটুঙ্গি তৈরী করান ; তাছাড়া অতিথিশালা তৈরী করান। এই মঞ্জিলের নব রূপ দেওয়ার সময় মোহনলাল এক জীর্ণ কূয়ার মধ্যে বহু স্বর্ণমুদ্রা আর মণি-রত্ন আবিষ্কার

করেন। সেগুলি নবাব সিরাজের হাতে তিনি অর্পণ করেন, বলেন—এ-ধনরত্নে রাজার অধিকার। আপনার তোষাখানায় রাখিয়ে দিন! নবাব সিরাজ হেসে জবাব দিয়েছিলেন—তা নয় দোস্ত্, তুমি যখন আবিষ্কার করেছো, তখন বুঝতে হবে খোদা এ-ধনরত্ন তোমাকেই দেছেন। এ-ধনরত্ন তোমার। এতে আমার কোনো অধিকার বা দাবী থাকতে পারে না। আমার মতিঝিলে, হীরাঝিলে গুপ্ত ধনাগার তৈরী করিয়ে আমি যেমন আমার নিজের মুদ্রা আর মণিরত্ন রেখে দিয়েছি, তুমিও তেমনি এ-সব রাখবার জন্য গুপ্ত ধনাগার তৈরী করো।

নবাব সিরাজের কথায় মঞ্জিলের মধ্যে যে ভবানীর মন্দির, তারি নাটমন্দিরের পাশে দীঘির বুকে মোহনলাল তখন জলটুঙ্গি তৈরী করান। তার নীচে গুপ্তগৃহ তৈরী করিয়ে সেই গৃহে ঐ-সব মণি-রত্ন-ধন রাখেন।

তারপর নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজের বিরোধ যখন অগ্নিচক্রে প্রজ্বলিত এবং বাংলার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মতো বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের দল আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো, তখন মোহনলাল বললেন মীরকাশিমকে—মন্ত্রণা-পরামর্শ সব নিষ্ফল হবে, জাঁহাপনা। এই বেনিয়া ইংরেজ-জাতকে পাশে নিয়ে শান্তি রক্ষা করা কঠিন। এরা ধূর্ত্ত, ন্যায়-ধর্ম্ম-বিবেকের কোনো ধার ধারেনা! স্বার্থ-উদ্ধারের জন্য এদের অসাধ্য কাজ নেই! এরা ধরে ফেলেছে আমাদের জাতের বুকে দুরন্ত জাগ্রত লোভের খবর, আর সেই

লোভকে ওরা বাড়িয়ে আমাদের হাত দিয়েই বাংলাকে শ্মশান করে' তুলবে! ন্যায়-যুদ্ধ এক জিনিষ, আর গোপন-রন্ধ্র দিয়ে ফেরেব-বাজীর অভিযান—আর এক জিনিষ! সম্মুখ-যুদ্ধের দিন আর নেই! কাকে এখন বিশ্বাস করবেন, কাকেই বা অবিশ্বাস করবেন, বোঝা যাচ্ছে না। আমিও যুদ্ধ করেছি, অস্ত্র ধরার বড়াই করেছি চিরকাল…এ-সব ফন্দীবাজীর অনুশীলন করিনি। কাজেই অস্ত্রবল যখন সম্পূর্ণ অকেজো, তখন আমায় বিদায় দিন। দেশকে রক্ষা করতে হলে এখন ধনের শক্তিতে ধনের দর্পে ঐ যে-সব ধনী অধর্ম্মের ভয় রাখে না, আগে তাদের শায়েস্তা করতে হবে।…তাদের শায়েস্তা করে সাধারণ প্রজাদের ডেকে প্রজা-শক্তির উপর যদি নির্ভর রাখেন, তবেই আশা আছে! নাহলে বাংলার ভাগ্য-রবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হবে, জানবেন!

এ-কথা শুনে মীরকাশিম কিছুক্ষণ নির্ব্বাক রইলেন, তারপর নিশ্বাস ফেলে বললেন—বড় বিলম্বে আপনি আমাকে সচেতন করলেন, দোস্ত্! আপনার এ-কথা সত্য বলে বুঝতে পারছি…লোভী বিত্তশালীদের রাজ্যের বনিয়াদ করেই রাজ্য আজ রসাতলে যেতে বসেছে…তারা রাজ্য চায় না, রাজ্যের মঙ্গল চায় না! দেশ বা দেশের সাধারণ মানুষ-জনকে তারা তাদের ধন-উপার্জ্জনের উপায় বলে' জেনে রেখেছে…এ-কথা বুঝে রাজ্য আর দেশ-রক্ষার জন্য যদি সাধারণ প্রজাকে আজ দরবারে আনতুম, তাহলে হয়তো…

মীরকাশিমের কথা শেষ হলোনা, তিনি একটা নিশ্বাস ফেললেন।

মোহনলালও নিশ্বাস চেপে রাখতে পারলেন না। নিশ্বাস ফেলে মোহনলাল বললেন—এ-জন্মে হলো না, তবে বুঝতে পারছি···বসুন্ধরা বীর-ভোগ্যা হলেও বীরের হাতে তাঁর পরিচর্য্যার দিন বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে। একদিন বসুন্ধরাকে রক্ষা করবে তাঁর সাধারণ ছেলেমেয়েরা···রাজার দরবারে বা ধনীর দ্বারে যাদের স্থান নেই, যারা অল্পে তুষ্ট, কায়িক-শ্রমে যারা বসুন্ধরাকে সম্পদশালিনী করে তুলেছে···

তারপর যা ঘটলো, ইতিহাসের পাতায়-পাতায় কালো কালির অক্ষরে তা চিরদিনের জন্য মুদ্রিত রয়েছে···লোভী বিশ্বাসঘাতকদের দৌলতে বাংলার মাটী, ভারতের মাটী কি করে' বিদেশীর হাতে চলে গেল—বিদেশীরা কি করে' এদেশীদের সর্ব্বহারা গোলাম-কি-গোলাম বানিয়ে তুললো!

কিন্তু ইতিহাসে এ-কথা লেখা নেই যে মোহনলালের মৃত্যুর পর তাঁর সেই বিরাট মঞ্জিল প্রথমে মীরজাফরের গোলামিয়ানার সেলামি-স্বরূপ কুঠিয়াল ইংরেজদের বাসভূমিতে পরিণত হয়েছিল; তারপর বাণিজ্যের দিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজার আর ভগবানগোলা ভেঙ্গে চুরমার করে ওদিকে ইংরেজের ক্লাইভ ষ্ট্রীট গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জিল হলো

জনহীন···সমাদর-ও-সজ্জাবিহীন···নানা রোগের আক্রমণে জরাজীর্ণ! ভবানী-মন্দিরের চূড়া গেল ভেঙ্গে···মন্দির গেল ধ্বংশে, জলটুঙ্গির দীঘি গেল হেজে-মজে'! মোহনলালের বংশধররা রেশমের ব্যবসা নিয়ে কোনোমতে দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

এ বংশের শেষ বংশধর চুণীলাল। চুণীলালের ছিল রেশমের কারবার। কিন্তু গোলামির মোহে দেশের ধনীরা যেদিন ফরাশী সিল্ক, আর গরীবরা বাবুয়ানা করতে জাপানী সিল্ক নিয়ে বহরমপুরী সিল্ককে ত্যাগ করলো, সেদিন থেকে চুণীলালের কারবার হলো নানা-রকমে বিপর্য্যস্ত এবং চুণীলাল ঋণ-ভারে নিপীড়িত।

ঋণের দায়ে জীর্ণ মঞ্জিল বন্ধকী-দায়-যুক্ত ছিল। যার কাছে বন্ধক ছিল, তার নাম উমিচাঁদ। হয়তো সিরাজের উমিচাঁদেরই লোভী-রক্ত এ-উমিচাঁদের দেহ থেকে এতকালেও বিলুপ্ত হয়নি! এ-উমিচাঁদের সঙ্গে সর্ত্ত ছিল,—পাঁচ বছরে ঋণ যদি শোধ না হয়, তাহলে ঋণের মাত্রা চক্রবৃদ্ধি-হারে সুদের সমষ্টি নিয়ে তার ষোলকলায় পূর্ণ হবে এবং উমিচাঁদকে দিতে হবে মঞ্জিলের দখল ছেড়ে···মঞ্জিলে চুণীলালের আর কোনো স্বত্ব থাকবে না···মঞ্জিলের পূর্ণ স্বত্ব হবে উমিচাঁদের··· তার পুত্রপৌত্র ওয়ারীশনাদিক্রমে।

চুণীলালের মেয়াদী সেই পাঁচ বৎসর পূর্ণ হবে···আজ সোমবার···আগামী সপ্তাহের সোমবারে।

উমিচাঁদ তার উকিল মারফৎ নোটিশ দিয়ে জানিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার উমিচাঁদ আসবে মঞ্জিলে,—মঞ্জিলের প্রত্যেকখানি ইট-কাঠ, কম্পাউণ্ডের মাটী-ঘাস···সব পরখ করে দেখবার জন্য। চুণীলাল জানলা-দরজা কড়ি-বরগা সরিয়েছে কিনা, পুকুর বুজিয়েছে কিনা, বাগানের মাটী ভেঙ্গে গাছ কেটে সম্পত্তির ক্ষতি করেছে কিনা, সব দেখতে !

চিঠি পড়ে সর্ব্বাঙ্গে যেন বিছুটির জ্বালা ! কিন্তু নিরুপায় ! যে ঋণী, তার আবার সুখ কি, দুঃখ কি···মান-অপমানই বা কি !

দীর্ঘ ইতিবৃত্ত শেষ করে' চুণীলাল বললেন—পূর্ব্বপুরুষের বাস্তু···সেটা রক্ষা করতে পারলুম না ! তবু শেষ কটা দিন তোমায় নিয়ে সে-পুণ্যতীর্থে জন্মের মতো বাস করবো, তাই তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি !

জহর নির্ব্বাক···ব্যথায়-বেদনায় তার দেহ যেন পাথর হয়ে গেছে !

চুণীলাল বললেন—তারপর···কোথাও একটু আস্তানার চেষ্টা দেখতে হবে।

জহর বললে—কোথায় দেখবেন ?

চুণীলাল বললেন—মঞ্জিলের কাছ থেকে বেশী দূরে যেতে পারবো না। এমন একটু জায়গা দেখে নেবো, যেখান থেকে মঞ্জিলের বাগানের গাছগুলো নজরে পড়ে ! বাতাস

যেন মঞ্জিল ছুঁয়ে সেখানকার মালতী-ফুলের গন্ধ এনে গায়ে বুলোয়...

কথার শেষে মস্ত দীর্ঘনিশ্বাস!

জহরের হাতের খাবার হাতে...খেতে প্রবৃত্তি নেই, রুচি নেই।

চুণীলাল বললেন—খেয়ে নাও জহর...সময় সংক্ষেপ... তারপর একটা কুলি ডাকি...তোমার লগেজ নিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

লালগোলা-প্যাশেঞ্জার শেয়ালদা ষ্টেশন ছেড়ে...দু-চারটে ষ্টেশন পার হয়ে প্রান্তর-বক্ষ ভেদ করে' চলেছে। খোলা জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে জহরলাল দেখছিল... পাশের ঐ-সব জলা নয়...মাঠ নয়...বাড়ী নয়...ঘর নয়... যেন পলাশীর মাঠে সেই দুশো বছর আগেকার সকরুণ দৃশ্য! কটা ইংরেজের পিছনে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ফিরছে কুকুরের মতো রুটির প্রত্যাশায়...নবাবের তাঁবুতে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ সিরাজ, আর সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে নীরবে বসে মোহনলাল! মাসিকপত্রে সেদিন দেখেছিল—নবীন শিল্পীর আঁকা ভীষ্মদেবের ছবি...ছবির-ভীষ্মদেবের সে মুখ...সে যেন জহরলালেরই সেই পরমপূজ্য অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ বীর মোহনলাল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঝড়ের রাতে

রাত এগারোটা বেজে গেছে। মঞ্জিলের দোতলার বারান্দায় বসে পিতা-পুত্রে কথা হচ্ছিল।

চুণীলাল বললেন—পিতৃপুরুষের বাড়ীটাকে খাড়া রাখতে পারিনি, জরাজীর্ণ হলেও এর মাটী, এর ইট-কাঠ···এ-সব আমার কাছে মন্দিরের চেয়েও পবিত্র। কিন্তু এমন হতভাগা আমি, সে-মাটীটুকুও রাখতে পারলুম না!

জহরলাল বুঝলো, বাপের বুকে এ-ব্যথা কি ভয়ানক বেজেছে! তারো বেদনার সীমা নেই! তবু বয়স তার কম···বিপদে নিস্তার পাবার উপায় কল্পনা করবার শক্তি আছে···ভবিষ্যতের আশা মনে জাগিয়ে তুলতে পারে সে! ট্রেণে আসবার সময় এই দুঃখ-দুশ্চিন্তার মাঝখানে এমন আশাও মনে জাগছিল, বাড়ী যায়, এখন না হয় যাবে। তারপর সে করবে দুর্জ্জয় সাধনা—লেখাপড়া শিখে ওকালতি, না হয় ব্যবসা-বাণিজ্য করে' অনেক টাকা রোজগার করবে··· তারপর সেই রোজগারের টাকায় এ-বাড়ী আবার নেবে কিনে! কল্পনায় সে দেখছিল, দিনের পর দিন টাকা রোজগার করছে···সে-টাকা থেকে খুব সামান্য কিছু খরচ করে' সামান্য-কিছু খেয়ে ছেঁড়া কাপড়-চোপড় পরে' কাটিয়ে

টাকা জমাচ্ছে! বিলাস নেয়, ব্যসন নয়—একটি-একটি করে টাকা জমিয়ে...মাসে একশো...বছরে বারোশো...দশ বছরে বারো হাজার...বিশ বছরে চব্বিশ হাজার...এমনি করে' সঞ্চয় হবে যেদিন অনেক...অনেক, সেদিন এই উমিচাঁদের সামনে ঝন্‌ঝন্ করে' টাকা ফেলে এ-বাড়ী আবার কিনে নেবে! ও যদি না বেচে? আলবৎ বেচবে! নগদ টাকার দাম এই-সব অর্থলোভী মহাজনের কাছে মাটীর চেয়ে অনেক বেশী।

চুণীলাল বললেন—আমাদের এই বাড়ীতেই জলটুঙ্গির নীচে ঘরে অনেক ধনরত্ন ছিল...লোকের মুখে-মুখে এ-গল্প চলে আসছে সেই নবাবী আমোল থেকে। আমার ছেলে-বেলায় আমার বাবা লোকজন দিয়ে ওদিকটা বিস্তর খোঁড়াখুঁড়ি করেছিলেন...কিন্তু এক-টুকরো লোহাও পাননি!

কথার শেষে চুণীলাল একটা নিশ্বাস ফেললেন।

বাপের মনের কথা বুঝে জহর বললে—ও-সব গল্প-কথা, বাবা...বোনেদী বড়মানুষদের বাড়ীর সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই এমন গল্প শোনা যায়।

চুণীলাল বললেন—আমিও খুঁজেছি জহর...গল্প বলে' জানলেও অভাবে পড়ে'! মনটা এমন হয়ে উঠেছিল... ভেবেছিলুম, এ-গল্প কেন রটবে...টাকাকড়ি যদি না পোঁতা থাকবে? কিন্তু কিছু মেলেনি!

জহর কোনো জবাব দিলে না...বাপের পানে চেয়ে রইলো।

চুণীলাল আর একটা নিশ্বাস ফেললেন, বললেন—আর

এই ক'টা দিন···তারপর এখানে আমাদের ঢোকবার অধিকার থাকবে না। গল্প হলেও কথাটা তোমাকে বললুম। তোমার ইচ্ছা থাকে, সমৃদ্ধি হারাবার আগে তুমি চেষ্টা করে' দেখতে পারো···শেষ চেষ্টা!

জহর বললে—আশায় নিরাশ হবো, বাবা।

চুণীলাল বললেন—কিছু বলা যায় না জহর···মা-ভবানীর যদি অনুগ্রহ হয়···পৃথিবীতে অসম্ভব অলৌকিক বলে' কিছু নেই। তোমরা ছেলেমানুষ···কতটুকু তোমাদের অভিজ্ঞতা! আমার বিশ্বাস, পৃথিবীতে অসম্ভব বলে' কিছু নেই!

এ নিয়ে বাপের মন এমন গভীর আচ্ছন্ন দেখে জহর তাঁর চিন্তার গতি ফিরিয়ে দেবে, ভাবলো। তাই একটু কৌতুক-হাস্যে সে বললে—অসম্ভব কিছু নেই, বাবা?

—না। চুণীলালের স্বর সবল সুদৃঢ়।

জহর বললে—আমাদের দেশ আর আমরা যে এই ইংরেজের পায়ের চাপে-চাপে পিষে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছি··· দেশের আর আমাদের ভাগ্য কখনো ভালো হবে, ভাবেন? ইংরেজের শোষণ থেকে দেশের মুক্তি আর গোলামির নাগপাশ থেকে আমাদের উদ্ধার···এ কখনো সম্ভব বলে' আপনি ভাবেন?

চুণীলাল বললেন—কেন সম্ভব নয়, জহর? পৃথিবীর পানে চেয়ে ছাখো···কোনো রাজ্য অমর হয়নি, কোনো শক্তি অজরামরবৎ খাড়া থাকেনি! অমন যে রাম-রাজ্য, সেও রসাতলে

গেছে! রাবণের সম্পদ-ঐশ্বর্য্য কটিমাত্র বছরে চূর্ণ হয়েছে··· কুরু-পাণ্ডবের হস্তিনা, ইন্দ্রপ্রস্থ···আজ তার কঙ্কালও নেই! তারপর অশোক···হর্ষবর্দ্ধন···বল্লাল···বাদশা আকবর···ঔরংজীব ···নবাব আলিবর্দ্দী···সিরাজ···মীরকাশিম···রাশিয়ায় জারদের আধিপত্য···আমেরিকার উপর ইংরেজের জুলুম···অত-বড় বীর নেপোলিয়ন···সে-সব যাবে, কে ভেবেছিল? ইংরেজও অমর নয়। রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফাট ধরে একদিন আচম্কা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে···দেখো! অনাচার···অত্যাচার··· ···পাপ······অবিচার···শ্রীবৎস রাজার গল্প পড়েছো তো, রন্ধ্রপথে তাঁর দেহে শনি প্রবেশ করেছিল···তেমনি ইংরেজের যে অত্যাচার, যে অনাচার আজ সীমা ছাপিয়ে উঠেছে···ভাবো, এর ফল তাকে ভোগ করতে হবে না? জগতে কিছুই অবিনশ্বর নয়, জহর।

জহর শুনলো···তার দেহ রোমাঞ্চিত হলো। নৈরাশ্যের অন্ধকারে সে যেন দেখলো আশার রশ্মি!

চুণীলাল বললেন—আমরা লড়ায়ে-বংশ···বিপদ-আপদের সঙ্গে চিরকাল লড়ে এসেছি। আজ এই দৈন্য-দুর্দ্দশা···বীরের মতো তার সঙ্গে লড়ে মানুষ হতে হবে···দুঃখ করোনা।

—না, বাবা। সেজন্য আমার কোনো দুঃখ নেই! তবে এই বাড়ীর উপর মায়া···বাড়ীর জন্য পৃথিবীর সব-কিছু আমি ত্যাগ করতে পারি! খ্যাতি, মান, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, বিলাস, আরাম···সব!

জহর আর নিশ্বাস চেপে রাখতে পারলো না, বড় একটা নিশ্বাস তার বুক থেকে ছিটকে বেরুলো!

চুণীলাল বললেন—অনেক রাত হয়েছে। পরিশ্রম গেছে, তার উপর মনের কষ্ট···শুয়ে পড়ো জহর।

জহর বললে—আমার ঘুম পায়নি বাবা।

চুণীলাল বললেন—ভগবান তবু আমাদের পথে দাঁড় করাননি! কিন্তু রহিম? বেচারী! নবাব সিরাজের দৌহিত্রের বংশ···মশনদে না বসলেও একজন বড় আমীর-ওমারাও হতো ···তা নয়, বেচারী করে বহরমপুরের কাছারিতে সামান্য চাপরাশির কাজ! তার ভাই শহীদ···কলকাতার বৈঠকখানা বাজারে ছোট্ট একটি দপ্তরীর দোকান তার! ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! ভাবি, মানুষ কিসের দর্প করে? কিসের জোরে তার অহঙ্কার?

জহর বললে—সত্যি বাবা, দেখে আমার হাসি পায়, লজ্জা হয়। আমাদের কলেজে পড়ে একটি ছেলে···ফোর্থ ইয়ারে। শুনি, তার বাবা করেন জজীয়তী···আই-সি-এস। বাবা ছিলেন গরীবের ছেলে, তবে খুব ব্রিলিয়াণ্ট কেরিয়ার···তার জোরে বিলেত থেকে আই-সি-এস হয়ে আসেন। নিজের কৃতিত্বে বড় হয়েছেন···কিন্তু তাঁর এই ছেলেটি? কোনো-দিন পুরো সাহেব সেজে কলেজে আসে— কোনোদিন গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে সোনার কার্ত্তিক! মোটরে করে' আসে···আমাদের সঙ্গে মেশে না! আমরা যেন

পথের কুকুর···এমন চোখে আমাদের দেখে! নিজের গুণের মধ্যে তিনবার বি-এ ফেল করেছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থায়নি। আমাদের কলেজে ঢুকেছে···কলেজের বাড়ী দেখে নাক সেঁটকায়···বলে, র‍্যাট্‌স্ হোল্! বেঞ্চগুলো···বলে, দরোয়ানদের বসবার অযোগ্য! প্রোফেশরদের বলে—থার্ড রেট···পুয়োরলি-পেড্ বেচারীজ্! আর আমরা? যেন শেয়াল-কুকুর! ভাবি, বাপ চোখ বুজলে···তোমার যে ত্রিশ-চল্লিশ টাকার চাকরি ছাড়া গতি হবে না! আর আমাদের মতো শেয়াল-কুকুরের সঙ্গে গায়ে গা মিশিয়ে ট্রামে-বাসে চড়তে হবে!

মৃদু হেসে চুণীলাল বললেন—আমাদের দেশে কথা আছে, নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেন! আজ বড়, কাল ছোট···ভগবানের দুর্লঙ্ঘ্য বিধান!···কিন্তু তুমি বসো—আমি শুতে যাচ্ছি।

জহর হঠাৎ চাইলো আকাশের দিকে। চতুর্দ্দশীর রাত্রি। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। আকাশে চাঁদ ছিল না···নিবিড় কালো অন্ধকার। এখন আকাশের দিকে চেয়ে দেখে, সে-অন্ধকারের উপর আরো দু-চার পর্দ্দা পুরু অন্ধকার···মেঘ জমছে। বললে—মেঘ করেছে, বাবা।

—হুঁ। উঃ···ভয়ানক মেঘ। তাহলে বসে থেকো না বাবা, তুমিও গিয়ে শুয়ে পড়ো।

—হ্যাঁ···আমি একটু পরেই শুতে যাবো।

চুণীলাল চলে গেলেন। জহর চুপ করে বসে রইলো। মনে হতে লাগলো, মণি-রত্নের যে গল্প-কথা শুনলো···তাতে আশ্চর্য্য রহস্য! এবং আকাশ যেন সে-রহস্যের সঙ্গে তাল রেখে মেঘের জালে আরো গভীর রহস্য জড়িয়ে তুলছে! চারিদিকে···যতখানি দৃষ্টি চলে, গাছপালার সঙ্গে মিশে অন্ধকার যেন আকাশ আর পৃথিবীকে এক করে' তুলেছে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দিগন্ত-বিস্তৃত অন্ধকারের পানে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে জহর! তার মনে হচ্ছিল, সারা প্রকৃতি যেন রুদ্ধ নিশ্বাসে স্তম্ভিত হয়ে আছে! প্রকৃতিও যেন ভাবছে —ইতিহাসের কথা, ভাগ্যের কথা। মনে হলো, বহু বহু বৎসর আগে—সেই নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন ছিলেন বাংলার মশনদে, তারি আদি-পুরুষ মোহনলাল যখন বাংলার শক্তি··· তখন এই জায়গাতে দাঁড়িয়েই হয়তো মোহনলাল ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখতেন! তখনো আকাশ জুড়ে এমনি মেঘ জমতো এবং সে-মেঘের পানে চেয়ে কখনো কি তাঁর এ-কথা মনে হয়েছিল যে তাঁরি বংশের উপর একদিন এমনি নিবিড় মেঘ নামবে···ঝড়ে-বজ্রাঘাতে বংশের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত চূর্ণ বিপর্য্যস্ত হয়ে যাবে?

হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকলো—দাদা···

চমকে জহর পিছন-পানে তাকালো। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না! বললে,—কে?

জবাব শুনলো—মহেশ।

—ও···মহেশদা।

—হ্যাঁ, দাদা। বাবা আজই আসতে পারবেন ভাবিনি। বলে গেলেন, তোমার দাদাকে আনতে যাচ্ছি। তা ঐ লালগোলার গাড়ীতে এলে?

—হ্যাঁ।

—আমি গিয়েছিলুম রহিম চাচার ওখানে। তার অসুখ। সাতদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেছে। তাকে দেখতে গিয়েছিলুম। ভালো আছে। রহিম চাচার ছেলে কাশেমকে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হবে না কি। চাচা দুঃখ করছিল··· বললে, স্কুলে ফ্রী পড়ছিল···সামনের বছর থেকে ফ্রী পড়া আর হবে না। সব খরচ বাড়ছে বলে ছেলেদের মাহিনাও দিচ্ছে বাড়িয়ে···ফ্রী-ট্রী ওরা উঠিয়ে দেবে!

—বটে!

জহর ব্যথিত হলো। কাশেম তারই সমবয়সী···কাশেমের পড়াশুনার ঝোঁক আছে···তারি কথায় স্কুলে ঢুকেছিল। জহর বোঝাতো তার বাপকে—কি-বংশের ছেলে কাশেম, বলো তো চাচা, ও করবে সামান্য চাকরি! সে-দিন থাকলে ওর পায়ের কাছে এখানকার সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটগুলো পর্য্যন্ত কুত্তার মতো ঘুরতো···আর ওরা কিনা করছে সেই সব ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপরাশীগিরি! নিশ্বাস ফেলে রহিম-চাচা বলেছিল—নশীব, বাপজান! এ-কথায় মাথা নেড়ে জহর বলেছিল—নশীব সকলের নিজের হাতে চাচা···নশীব বলে' মাথার উপর দোশরা

মনিব বা খোদা কেউ নেই। যারা কুড়ে, কাজ করবে না, তারাই নশীবের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কুড়েমির সাফাই গায়! জানো, আমাদের সংস্কৃততে একটা শ্লোক আছে—ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ। সিঙ্গী যদি নশীবের দোহাই পেড়ে পড়ে-পড়ে ঘুমোয়, তাহলে একটা নেংটি ইঁদুর পর্য্যন্ত তার মুখে ঢুকে সিঙ্গীর উদর-পুর্ত্তির সাহায্য করবে না! পেট ভরাতে হলে সিঙ্গীকে সজাগ থেকে উদ্যোগ করতে হবে শীকার-সন্ধানের! এবং এমনি নানা কথায় ভবিষ্যতের রঙীন একটু ছবি এঁকে কাশেমকে সে ভর্ত্তি করিয়ে দেয় বহরমপুরের স্কুলে। বয়স বেশী হলেও অল্প-বয়সী ছেলেদের সঙ্গে এক-ক্লাশে বসে পড়াশুনা করতে কাশেম এতটুকু লজ্জা বোধ করেনি। কি মন দিয়ে সে লেখাপড়া করছে···ক্লাশ-এগজামিনে নম্বরও এযাবৎ মন্দ পায়নি। স্কুলের পড়া তাকে বন্ধ করতে হবে···

জহর বললে—কাশেম এখানে আছে? না, বহরমপুরে?

—এইখানেই আছে।

—কাল সকালে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবো'খন···দেখি, ভেবে-চিন্তে তার লেখাপড়ার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়। পড়া ওর ছাড়া হবে না, কি বলো মহেশদা'?

মহেশ এ-বাড়ীর খানশামা। পুরুষানুক্রমে তাদের এ-বাড়ীতে চাকরি। বংশ-তালিকার সন্ধান করলে হয়তো দেখা যাবে, এই মহেশেরও কোনো পূর্ব্বপুরুষ ছিল এককালে

মোহনলালের খাশ-খানশামা! ভারী অনুগত……ভারী বিশ্বাসী। মনিবের সুখ-দুঃখকে মহেশ নিজের সুখ-দুঃখ বলেই জানে।

—কাল একবার যেয়ো দাদা…

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে বাতাসের ভেরী বেজে উঠলো…পাতায়-পাতায় নিমেষে জাগলো দোলন…এবং চকিতে বিকট ঝঞ্ঝনা-রোল তুলে বীর সেনাপতির মতো পবন এসে নামলো পৃথিবীর বুকে! আকাশে মেঘের দারুণ ছুটোছুটি…সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুতের চক-মকানির শব্দে বাজের বিরাট নির্ঘোষ…নিঃশব্দ প্রকৃতি ভয়ে যেন আর্ত্ত-রব তুললো…ধুলো-বালি কাঠি-কুটো উড়ে পড়তে লাগলো ফৌজের অজস্র শর-বর্ষণের মতো!

মহেশ বললে—ঘরে চলো দাদা…কথা আছে।

ঘরে যাওয়া ছাড়া গতি নেই…দুজনে ঘরে এলো। বাহিরে চললো বাতাসের উদ্দাম লীলা…

মহেশ বললে—বাবার মুখে সব শুনেছো দাদা?

—শুনেছি।

মহেশ বললে—এ বিপদ ঠেকাবার কোনো উপায় নেই?

—কি উপায় হবে, মহেশদা?

—ওদের কাছ থেকে সময় চাইলে কিছুদিন সময় দেবে না? ধরো, এক মাস?

—ক্ষেপেছো! যারা মহাজনী কারবার করে, টাকা ছাড়া দুনিয়ায় তারা আর-কিছু জানে না···কিছু মানে না। মানুষকে মানুষ ভাবে না···তাদের দয়া থাকে না···ধর্ম্ম থাকে না···কিছু থাকে না।

নিশ্বাস ফেলে মহেশ বললে—রহিম-চাচা বলছিল, উমিচাঁদ ব্যাটারা পুরুষানুক্রমে দেশের বোনেদী ঘরগুলোকে ভেঙ্গে আসছে······এতেই ওদের সুখ······এতেই ওদের আনন্দ!

মহেশ কিছুক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো···দু'চোখের দৃষ্টি জহরের মুখে নিবদ্ধ।

জহরও যেন কি ভাবছিল···হঠাৎ বললে—আচ্ছা মহেশদা, আমাদের মন্দিরের এই ভবানী ঠাকুর জাগ্রত? মানে, সত্যিকারের দেবতা তিনি? প্রাণে মায়া-দয়া আছে? না, পাথরের মুর্ত্তি?

কথা শুনে মহেশ যেন আঁৎকে উঠলো···অলক্ষ্য উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি-পুটে নতি জানিয়ে মহেশ বললে—ছি-ছি-ছি, এমন কুস্তানী কথা মনেও আনতে নেই, দাদা···ঠাকুর জাগ্রত কি না, জিজ্ঞাসা করছো! তুমি ছেলেমানুষ, তাছাড়া লেখাপড়া নিয়ে সহরে থাকো···ঠাকুর-দেবতার খবর তুমি কি রাখবে? একবারের কথা তাহলে বলি, শোনো দাদা···বাবার তখন খুব অসুখ···তুমি তখন এতটুকুন্‌টি···দু' বছর, না, তিন বছর বয়স··· সে-অসুখে কিনারা মিলছিল না···কত বদ্যি এসে দেখে গেল···

তাছাড়া মুর্শিদাবাদের নবাব-বাহাদুরের খাশ হেকিম-সাহেব। সকলে বলে গেল, না, রক্ষে হলো না। বিলিতি ডাক্তারীর উপর বাবার ভয়ানক রাগ···তবু তখন তিনি তো অজ্ঞান অচেতন···মা আর দাদামশাই দুজনে মিলে বহরমপুরের সাহেব-ডাক্তারকে আনালেন। সে-ও মাথা নেড়ে পকেটে টাকা গুঁজে সুড়্‌সুড়্ করে চলে গেল। মা তখন করলে কি, জানো দাদা? ভবানী-মন্দিরে মায়ের সামনে হত্যা দিয়ে পড়লেন··· সারা রাত···তার পরের দিন বেলা পাঁচটা বাজে, তখনো। হঠাৎ আকাশ জুড়ে মেঘ···তার পর যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি··· মা স্বপ্ন পেলেন—ঝড়ে ঐ বুড়ো বেল-গাছ পড়ে গেছে···সে গাছে শুধু একটি বেল আছে···বেলটা নিয়ে তার ক্বাৎ তৈরী করে সেই জল খাইয়ে দে···কোনো ওষুধ নয়···ব্যস্! মা সে কথা বললেন। বাগানে গিয়ে দেখেন, বেলগাছ পড়ে গেছে শিকড় উপড়ে···আর সে-গাছে একটিই শুধু মস্ত বেল···সেই বেল এনে তার ক্বাৎ তৈরী করে' বাবুকে খাওয়ানো হলো··· রাত্তির তখন প্রায় দশটা। বললে পেত্যয় হবে না দাদা··· আমরা তো দিন-রাত বাবার শিয়রে বসে, ক্বাৎ খাওয়াবার পর রাত্রি বারোটায় বাবা চোখ খুললেন···আর বলবো কি তোমায়, অসুখও তাই থেকে সেরে গেল!

জহর শুনলো, বললে—হুঁ···আচ্ছা, আজো তো জল-ঝড় ······দেখি, ভবানী-মা আমাদের ভিটে রক্ষে করেন কি না।

মহেশ বললে—ভক্তি করে তাঁকে ডাকলে কি হয় না দাদা? হয়। আজো চন্দর-সূয্যি উঠছে…এখনো পাপের সাজা মানুষ পৃথিবীতে পাচ্ছে। যাক্, রাত হয়ে গেছে, শুয়ে ঘুমোও। আমি তোমার ঘরের বাইরে দালানে পড়ে থাকবো…দরকার হলে ডেকো।

জহর বললে—শুয়েই পড়ি…কাল উঠে একটা কিছু করবো। কি করবো…শুয়ে শুয়ে ভাবি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে

অনেক রাত···জহরের ঘুম গাঢ়···হঠাৎ বাজের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল! জহর উঠলো। বাগানের ওদিককার বড় খড়খড়ি খোলা। এ-ঘরে খড়খড়ি লাগিয়েছিল কুঠিয়াল-সাহেবরা। সে খড়খড়ি যেমন বড় তেমনি মজবুত···সার্শির কাঁচ কতকগুলো ভেঙ্গে গেছে।

খড়খড়ির সামনে এসে জহর দাঁড়ালো। তখনো বৃষ্টি চলেছে···তবে বেগ একটু কম···আকাশ তেমনি মেঘে ভরা··· নক্ষত্রের চিহ্ন নেই···বাতাস জোরে বইছিল···আর মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের চকমকানির সঙ্গে মেঘের আতঙ্ক-জাগানো ডাক!

জহরের মনেও এমনি মেঘের ভার! মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর আলো যেন জন্মের মতো নিবে গেছে···সকালে আবার আলো জাগবে কি না, এমন সংশয়ও মনে না জাগছিল, এমন নয়! অর্থাৎ মনে এক অপূর্ব্ব ভাব!

খড়খড়ির নীচে বাগান···বাগানে প্রাচীন কালের ভবানী-মন্দিরের ধ্বংস-স্তূপ···এখন আর পূজারী-ভক্ত আসে না তেমন। হয়তো মহাদেবের সাপগুলোই ও-বাগানে মনের সুখে খেলা

করে বেড়ায়! হঠাৎ বিদ্যুতের চমক…সেই চকিত-আলোর চমকে জহরের মনে হলো, নীচেকার বাগানে কাপড়-মুড়ি দিয়ে কে একজন সন্তর্পণে…

ভূত? জহর মনে-মনে হাসলো। ভূত সে মানে না… ভূতের ভয় তার মনে কখনো এতটুকু স্থান পায়নি। ভূত নয়, জহর তা বিশ্বাস করে। তবে?

চোখের ভুল? ভাবলো, টর্চ্চ তো আছে…ঘরের টেবিলেই। টর্চ্চ ফেলে দেখবে না কি?

টর্চ্চ আনতে যাবে, আবার বিদ্যুতের চমক! এবার বিদ্যুতের আলোয় যা দেখলো…না, চোখের ভুল নয়…স্পষ্ট দেখেছে…কাপড়-ঢাকা মূর্ত্তি…নিথর নিস্পন্দ নয়…মূর্ত্তি চলে' বেড়াচ্ছে…এবং খুব সন্তর্পণে!

কে? চেঁচিয়ে প্রশ্ন করবে? মন বললে, না। নিশ্চয় কোনো মতলববাজ লোক…নাহলে এ-বৃষ্টিতে ঐ ভাঙ্গা মন্দিরে…সাপখোপের গর্ত্তে আসে!

ভাবলো, মহেশকে ডাকবো? পরক্ষণে স্থির করলে, না! হয়তো কিছুই নয়…এর জন্য বেচারীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে আবার কষ্ট দেবে? বিদ্যুতের আলো যে-রকম ঘন-ঘন ফুটছে, ও আলোয় দেখা যাক, মূর্ত্তির গতিবিধি আর একটু। কাঠ হয়ে জহর দাঁড়িয়ে রইলো…লক্ষ্য স্থির…উদগ্র একাগ্র কৌতূহল নিয়ে!

মানুষ! তাতে ভুল নেই! কিন্তু কে? এ-বাড়ীতে

কারো সঙ্গে দরকার থাকলে···ও-পথটা এ-বাড়ীতে আসবার পথ নয়···ও-পথে আসবে চোর, নয়তো কোনো ফন্দীবাজ···মানুষের নজর বাঁচিয়ে ও আসতে চায়!······যাবে নাকি ছুটে ?

কিন্তু ছুটে গেল না। ভাবলো, দেখা যাক···কোথায় ও যায়! কোন দিকে ফেরে!···তাছাড়া জহর এ-বাড়ীতে আসছে বহুকাল পরে···ওধার দিয়ে বাড়ীতে ঢোকবার যে-দরজা···সে-দরজা খোলা আছে, না, বন্ধ আছে···তা সে জানে না!

ওকে লক্ষ্য করা যাক। এখন মহেশকে ডাকতে গেলে সেই ফাঁকে ও-মূর্ত্তিকে যদি হারিয়ে ফেলে! তার চেয়ে···

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো জহর। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে···গাছপালার দোলায় বাতাসের আস্ফালন···আবার চকমকিয়ে বিদ্যুৎবহ্নির বিকাশ। এবারের এ-আলোয় জহর দেখে, মূর্ত্তি ছুটছে···ওদিকে। কি জন্য ? কি দেখেছে ? কিসের লোভে ?

জহর আর স্থির থাকতে পারলো না···টর্চ্চ-হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। নিশুতি বাড়ী···বাবা চুণীলাল শুয়েছেন ওদিককার ঘরে। বেরিয়ে যাবার সময় টর্চ্চের আলোয় শুধু দেখে গেল, মহেশ গাঢ় ঘুমে অচেতন—তার নাকে যেন দুশো বাঘ গর্জ্জন করছে!

ভিতর-দিককার সিঁড়ি দিয়ে জহর নীচে নামলো। কতকালের অব্যবহারে সিঁড়ি আবর্জ্জনায় ভরে' আছে···আর্শুলা আর চামচিকে সিঁড়িতে নেছে আশ্রয়, অকস্মাৎ তাদের

মানুষ! তাতে ভুল নেই! কিন্তু কে?

[পৃঃ ৩১

নিরাপদ আশ্রয়ে মানুষের আবির্ভাবে তারা চঞ্চল হয়ে হুটোপাটি সুরু করে দিলে।

জহর নীচে এলো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে মস্ত একটা দালান। সেই দালানের ও-প্রান্তে দরজা। দরজা খোলা ছিল। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঠোন...জঙ্গলে ভরে যা হয়ে আছে... মনে হয়, বাঘ-ভাল্লুক না হলেও সাপখোপের বাস বিচিত্র নয় ওখানে!

কিন্তু সাপখোপের কথা তখন মনেও এলো না। জহর উঠোন মাড়িয়ে ঢেঁকিশাল পার হয়ে খিড়কীর দরজায় এলো। মস্ত দরজা...লোহার বড় বড় গুল-আঁটা। সে দরজা বন্ধ। সে দরজার ওদিকে ঠাকুর-বাড়ী। জহর দরজা খুললো... বাহিরের জমাট অন্ধকার যেন বাতাসের বেগে ছিটকে ভিতরে ঢুকে পড়লো! দরজা ছেড়ে জহর এগুলো না...অন্ধকারের গায়ে টর্চ্চের আলো বুলিয়ে-বুলিয়ে দেখতে লাগলো, কোথাও কোনো সজীব সচল জীবের সন্ধান মেলে কি না।

নিঃশব্দ দিক...অনেক দূরে কোথায় দুটো কুকুর ডাকছিল, আর শুধু ঝড়ের গর্জ্জন। জহরের মনে হচ্ছিল, কি যেন এক অঘটন সৃষ্টির জন্য আকাশে-বাতাসে প্রচণ্ড আয়োজন চলেছে... এ যেন সে আয়োজনের সূচনা! ধীরে ধীরে এ সূচনা এখনি হয়তো রুদ্র ভৈরব তালে প্রমত্ত হয়ে উঠবে।

এক মিনিট...দু' মিনিট...পাঁচ মিনিট কাটলো...কোথাও কেউ নেই। সে-মূর্ত্তির কোনো চিহ্ন নয়। ভুল? ভুল হতে

পারে না! চোখে স্পষ্ট দেখেছে। নিশ্চয় অভিসন্ধি-বশে কে এসেছিল···এ-দরজা বন্ধ দেখে হয়তো সরে' পড়েছে।

পড়ুক সরে'! হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

খিড়কী বন্ধ করে' জহর দোতলায় এলো।

মহেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছে টর্চ্চের আলো ফেলে, সে আলোয় পথ দেখে। মহেশের চোখে টর্চ্চের আলো পড়লো··· ঘুম ভেঙ্গে মহেশ চোখ মেলে চাইলো···চাইতেই দেখে, জহর।

মহেশ ডাকলো—দাদা?

—হ্যাঁ।

—কোথায় যাচ্ছো? প্রশ্ন করে' মহেশ উঠে বসলো।

জহর বললে—একবার খিড়কির দিকে গিয়েছিলুম।

—হঠাৎ?

—একটা ব্যাপার ঘটেছিল, মহেশদা।

—কি ব্যাপার দাদা?

কৌতূহলে মহেশের চোখ দুটো যেন ঠিকরে পড়বে! সোজা সে দাঁড়িয়ে উঠলো।

জহর বললে—ঘরে এসো, বলছি।

দুজনে এলো জহরের ঘরে এবং জহর বললে মহেশকে ···একটু-আগে স্বচক্ষে যা দেখেছিল···এবং দেখে···

শুনে মহেশ একটা নিশ্বাস ফেললে, বললে—তাহলে বলি শোনো দাদা। দশ-বারো দিন আগে···আর এক রাত্রে দুজন

লোক এসেছিল বাগানে। একজন অন্ধকারে হুঁচোট খেয়ে পড়ে গেছলো…পায়ে বেশ জখম…ফিরতে আর পারেনি… ঠাকুর-বাড়ীর দালানে পড়েছিল। সকালে পুরুত-ঠাকুর এসে তাকে দেখেন। তাকে নিয়ে কি টানাটানি না চললো! কে… কি-বৃত্তান্ত…বাগানে ঢোকে কেন? কাচুমাচু হয়ে সে বললে, গরীব মানুষ…আস্তানা নেই…আশ্রয় নিতে ঠাকুর-বাড়ীতে এসেছিল…তারপর পড়ে গিয়ে পায়ে জখম। তবু আমি ছাড়িনি…বললুম, ঠাকুর-বাড়ীতে এসেছিলে যদি তো পগার ডিঙ্গিয়ে ভাঙ্গা পাঁচিল গোলে কেন এসেছিলে? ঠাকুর-বাড়ীতে আসবার দরজা রয়েছে তো, সে দরজা দিয়ে ঢুকতে কী হয়েছিল? তাছাড়া অত-রাত্রে চোরের মতো আসা? তা জবাব ছায় না কোনো কথার! মুখের পানে হাঁ করে' চেয়ে থাকে…দু'চোখে জল নিয়ে। কিছু চুরি-চামারি করেনি দেখে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো! লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়েছিল বটে!

জহর বললে—বাগানের ওদিকে পাঁচিল আছে তো?

—আছে, তবে মাঝে-মাঝে ভেঙ্গে গেছে দাদা…মেরামত তো আর হয়নি। যে-সে উটকো-মানুষ মনে করলেই বাগানে আসতে পারে।

—বটে…

নিশ্বাস ফেলে জহর কি ভাবতে লাগলো।

মহেশ বললে—কি ভাবছো?

জহর বললে—ভাবছি, ঠাকুর-বাড়ীর পোঁতা ধনের কথা এ-তল্লাটে কে না জানে! ফাঁকতালে মাটী খুঁড়ে যদি কিছু পায়···তাই মনে করে' এদের আসা-যাওয়া ঘটছে না তো মহেশদা?

—বিচিত্র নয়, দাদা। বাবাকেও তাই বলছিলুম, ভিটে যদি ছাড়তে হয় তো একবার খুঁড়ে-খাঁড়ে ভালো করে' দেখে গেলে হয়।

—বাবা কি বললেন?

—বললেন, পণ্ডশ্রম হবে মহেশ···অনেকেই তো খোঁড়া-খুঁড়ি করেছেন।

জহর বললে—সব শুনে আমারো মনে হচ্ছে মহেশদা, একবার বেয়ে-চেয়ে দেখলে হয়।

উৎসাহ-ভরে মহেশ বললে—দেখবে দাদা?

—কিন্তু কত খুঁড়বো মহেশদা? খুঁড়তে খুঁড়তে যে দীঘি বানিয়ে ফেলবো!

—তবু···দেখা উচিত। কে জানে, পূর্ব্বপুরুষের ধন-সম্পত্তি শেষে ঐ বকাসুর মহাজনটার পেটে যাবে? সেই কথা ভেবেই আরো আমার ইচ্ছা। ভিটে যদি থাকতো, তাহলে দরকার ছিল না, পোঁতা ধন পোঁতাই থাকুক। কিন্তু···

জহর বললে—যা বলেছো! আচ্ছা, কাল সকালে বাবাকে আমি ভালো করে বলবো। সত্যি···এতদিন যেন খেয়াল হয়নি কারো! এমন তো শুনেছি···গল্প পড়েছি···পূর্ব্ব-পুরুষের

পোঁতা ধন বংশের দারুণ দুর্দ্দিনে হঠাৎ পেয়ে যাবার ফলে কত লোক অমন রক্ষা পেয়েছে।

—তাই করো দাদা। সত্যি…যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ!

—হুঁ।

রাত তখন প্রায় দুটো…পরের দিন যা হয় করা হবে, স্থির করে' দুজনে আবার শুতে গেল। জহরের চোখে ঘুম কিন্তু আর আসে না। কল্পনা তার মনে বিচিত্র ছবি এঁকে চললো—মুগ্ধ দর্শকের মতো সেই-সব ছবি দেখতে লাগলো জহর।

যেন পঞ্চাশ-ষাটজন লোক লেগেছে…শাবল, কুড়ুল, গাঁইতি নিয়ে! খুঁড়ে তারা তুলছে শুধু রাশি রাশি মাটী…ঝুড়ি বোঝাই করে' সে-মাটী বাইরে ফেলে আসছে। একদিন…দুদিন…তিন-দিন খোঁড়া চলেছে, তার পর চতুর্থ দিনে মন্দিরের ভবানীদেবী যেন সামনে এসে উদয় হয়েছেন! তাঁর হাতে মস্ত থালা…আর সেই থালার উপর সাজানো পাহাড়-প্রমাণ মণি-রত্ন…হীরে, চুণী, মুক্তা অজস্র!

ভবানী দেবী যেন ডেকে বলছেন—দুঃখ ঘুচলো রে! পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত মণি-রত্ন নিয়ে দুর্দ্দশা ঘুচিয়ে ফ্যাল্। তারপর বড় রকম কিছু কর্। বীরের বংশ…তোদের অনেক কর্ত্তব্য আছে…শুধু নিজের উপর কর্ত্তব্য নয়, দেশের উপরও।

আলোয় চারিদিক যেন ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো···জহরের দু' চোখ বিস্ফারিত···কল্পনায় সে বিভোর···এমন সময় কক্কড় শব্দে বাজ পড়লো···খুব কাছে। সে-শব্দে চম্‌কে জহর জেগে উঠলো।

কোথায় ভবানী দেবী? নিশ্বাস ফেলে সে ভাবলো, হায় রে, এ স্বপ্ন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জলহস্তী

তার পর জহর আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছে···ঘুম ভাঙ্গলো মহেশের আহ্বানে।

চোখ খুলে জহর দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে মহেশ···ঘরে রৌদ্র এসে পড়েছে···রাতের দুর্য্যোগ কখন কেটে গেছে!

মহেশ বললে—কাশেম সাহেব এসেছে···তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

—কাশেম!

ধড়মড়িয়ে জহর উঠে পড়লো, তারপর মুখ-হাত ধুয়ে নীচে নেমে এলো। বাহিরের বৈঠকখানায় এসে দেখে, রহিমচাচা, কাশেম আর চুণীলাল···তিনজনে কথা কইচেন।

চুণীলাল বললেন—তোমার চাচীজী হালুয়া তৈরী করে পাঠিয়ে দেছেন, জহর। কাশেম হালুয়া এনেছে···খেয়ে নাও।

খাবার তেমন ইচ্ছা ছিল না···কিন্তু আদরের উপহার!

জহর বললে—এসো কাশেম, ও-ঘরে গিয়ে আমরা খাই।

দুজনে এলো পাশের ঘরে। কাশেম খুললো রুমালের বাঁধন থেকে একটি কৌটো···তার মধ্যে হালুয়া।

জহর বললে—দুজনে ভাগ করে' খাবো কিন্তু···

কাশেম বললে—এ হালুয়া তোমার।

—তা হোক...একা এতখানি খেতে পারবো না। দুজনে ভাগ করে খাবো।

তাই হলো...দুটি গেলাশে করে' মহেশ জল নিয়ে এলো।

খেতে খেতে দুজনে কথা হচ্ছিল:

জহর বললে—শুনেছো তো...ভিটে ছেড়ে দিতে হবে... এখানে আর ছটা দিন মাত্র বাস। তার পর এ-সবে আমাদের কোনো অধিকার আর থাকবে না। এ-বাড়ীতে ঢুকতেও পাবো না কাশেম—এ বাড়ী হবে পরের।

নিশ্বাস ফেলে মুখখানা কাঁচুমাচু করে' কাশেম বললে—শুনেছি। বাপজান্ কাল রাত্রে তাই বলছিল, দুনিয়ার সব কি উল্টে যাবে? বড়র দল হুমড়ি খেয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়বে আর ছোটরা ভুঁইফোঁড়ের মতো গজিয়ে উঠবে? মানী লোকের মান গুঁড়িয়ে ধূলো হতে থাকবে?

জহর বললে—কর্ম্মফল কাশেম। এর জন্য আপশোষ করলে চলে না। কুড়ের মতো বসে যদি শুধু অতীতের স্বপ্ন দেখি, তাহলে বর্ত্তমানের সঙ্গে চলতে পারবো কেন? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা...এ বীরত্ব শুধু অস্ত্রের ফলায় নয়, চিন্তায় কাজে আমাদের ভালো করে' জাগিয়ে তুলতে হবে! কালের সঙ্গে তাল রেখে সমানে যে চলতে পারবে না, তার পক্ষে বেঁচে থাকাই শক্ত! জানো তো কথায় বলে, সার্ভাইভাল অফ্ দী ফিটেষ্ট।...এই যে রহিমচাচা...মান নিয়ে বসে থেকে

থেকে কি দুর্দ্দশাই না হয়েছে তাঁর! নবাব সিরাজদ্দৌলার বংশধর···আলীবর্দ্দির রক্ত যাঁর দেহে, তিনি করছেন সামান্য চাপরাশির কাজ···দু' মুঠো অন্নের জন্য!

নিরুপায় হতাশের মতো কাশেম চাইলো জহরের পানে··· কোনো জবাব দিলে না।

জহর বললে—সেকালে নবাবের দরবারে অস্ত্রের মান ছিল। আমরা অস্ত্র নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা সম্মান আর অর্থ উপার্জ্জন করেছি। একালে ইংরেজ আমাদের অস্ত্রহীন পঙ্গু করে রেখেছে। এখন সম্মান বজায় রাখতে গেলে বিদ্যায় বুদ্ধিতে ইংরেজের চেয়ে বড় না হই, সমান হতে হবে অন্ততঃ!···নাহলে বিদেশী শত্রুকে ওরা মানবে কেন? রহিমচাচা মান করে' শুধু উর্দ্দু পড়া নিয়ে রইলেন···সংসার তার দাবী নিয়ে চেঁচাতে লাগলো। নিরুপায় হয়ে রহিমচাচা তুচ্ছ গোলামির ঐ চাকরি নিলেন। তাই লেখাপড়া করবার জন্য তোমায় সাধাসাধি করেছি। ইংরেজের বিদ্যা আয়ত্ত করে ওদের সঙ্গে সমানে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে আগে, বোঝাতে হবে, আমাদের চেয়ে তোমরা বিদ্যায় বা বুদ্ধিতে বড় নও!···তার পর নিজেদের পাওনা-গণ্ডা নিতে হবে আদায় করে'। কিন্তু যাক ···এ-সব কথা পরে। কাল থেকে আমার মাথায় শুধু একটি চিন্তা জাগছে কাশেম···কি করে' উর্মিচাঁদের হাত থেকে ভিটেটাকে বাঁচানো যায়! দেনা আছে মানি, কিন্তু যে-টাকা ধার করা হয়েছে···তা শোধ করতে এ-ভিটে ওর হাতে তুলে

দেওয়া···ইংরেজের আইন আমাদের জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলবে না···এতটুকু দরদ করবে না! কিন্তু এ ভিটের দাম কি টাকা-পয়সায় মাপা যায়? কত কত পুরুষ এ ভিটেয় বাস করে' গেছেন, যাঁদের নাম বাংলার ইতিহাসকে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল করে' রেখেছে।

নিশ্বাসের বাষ্পোচ্ছ্বাসে জহরের কণ্ঠ রুদ্ধ হলো।

কাশেম বললে—বাপজান একটা কথা বলছিলেন···

—কি কথা? জহর ফিরে তাকালো কাশেমের দিকে।

কাশেম বললে—বাপজান্ বলছিল, নবাবী মোহর··· তাছাড়া কত মণি-মাণিক···এ-বাড়ীর জলটুঙ্গিতে যে তোষাখানা ছিল, সেই তোষাখানার মাটীর নীচে পোঁতা আছে।

জহর বললে—সে-কথা আমরাও তো চির কাল শুনছি··· তাছাড়া বাবা বলছিলেন, পূর্ব্ব-পুরুষদের মধ্যে কেউ-কেউ মাটী খুঁড়ে অনেক সন্ধান করেছিলেন···একটা কড়িও কেউ পান নি কিন্তু। আমার মনে হয়, কুঠিওলা সাহেবরা তা সাফ করে নিয়ে গেছে। ওদের মতো লুঠবাজ আর কনসেন্স-হীন জাত দুনিয়ায় আর নেই তো!

কাশেম বললে—তবু আমার মনে হয়, বাড়ীর আর জমির দখল ছেড়ে দেবার আগে ভালো করে' সন্ধান করা দরকার।

নিশ্বাস ফেলে জহর বললে—তোমার তাই মত?

—নিশ্চয়। বাপজান তাই আজ সকালেই এসেছেন··· চাচাজীকে অনুরোধ করতে।

—হুঁ।...

তারপর কিছুক্ষণ দুজনে চুপ। সে-স্তব্ধতা ভঙ্গ করে জহর বললে—কাল রাত্রে কি দেখেছি জানো, কাশেম?

—কি?

জহর বললে সেই ঝড়ে-জলে-দুর্যোগে এক মূর্ত্তির সতর্ক বিচরণ, তারপর তার আকস্মিক তিরোধানের কাহিনী।

শুনে কাশেম বললে—ঠাকুর-বাড়ীর বাগানে তাকে দেখেছিলে?

—হ্যাঁ।...আসবে? ঠিক করেছি, সকালে সে-জায়গায় গিয়ে সন্ধান করবো।

কাশেম বললে—তাহলে দেরী নয়...চলো জহর...দুজনে চুপিচুপি বাগানে যাই।

দুজনে এলো ঠাকুর-বাড়ীর বাগানে। ভিজে মাটীর উপর পায়ের দাগ...তখনো সুস্পষ্ট চিহ্নিত রয়েছে।

সে-দাগ দেখে জহর বললে—এই ছাখো, দুর্দ্দশাগ্রস্তের স্বপ্ন দেখা নয় তাহলে কাশেম...মানুষের পায়ের দাগ...এই...তাজা দাগ।

—হুঁ।

তখন সেই পায়ের দাগ লক্ষ্য করে দুজনে এলো নাটমন্দিরের পিছনে। এখানে একখানা পাথর চিরে হাড়-কাঠ তৈরী রয়েছে।

তৈরী হয়েছে সে কোন্ আদি যুগে, কে জানে! এ-হাড়কাঠে সেকালে কত পশু বলি হতো—ভবানী দেবীর ভোগের উদ্দেশে। পূজার সে জাঁকজমক বহুকাল ঘুচে গেছে···সঙ্গে সঙ্গে বলির পাটও গেছে উঠে। পাথরখানা রক্তে-রক্তে আশ্চর্য্য বর্ণ ধারণ করে' পড়ে আছে। এই হাড়কাঠ একখানা শ্বেত-পাথরের সঙ্গে গাঁথা···বলি হতো, তারপর বলির পশুকে ফেলে দেওয়া হতো এই শ্বেত-পাথরের উপর।

শ্বেত-পাথরের গায়েও মানুষের কাদামাখা পায়ের দাগ।

কাশেম বললে—পাথরের উপরেও সে উঠেছিল···একই পায়ের মাপ দেখছি।

জহর বললে—হুঁ···তারপর একটু চিন্তা করে' আবার বললে,—কিন্তু এ-পাথর মাড়িয়ে এদিকে আসবার তার কি দরকার ছিল?

কাশেম কি ভাবলো, তারপর বললে—ব্যাপার খুবই সন্দেহজনক। আমি বলি ভাই জহর, এখান থেকেই সন্ধান সুরু করো। দেরী নয়। এখনি আমি কুলি ডেকে আনচি। মোল্লাপাড়ায় ইঁদারা খুঁড়ছে এক-দল কুলি, তাদের মধ্যে থেকে দু'তিনজনকে ডেকে আনি বেশ জোয়ান দেখে···কি বলো?

—এখনি আনবে?

—হ্যাঁ।

—বেশ, আনো।

বাগানের ভাঙ্গা পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে কাশেম গেল কুলি ডাকতে ...জহর চারিদিকে চাইতে চাইতে সুরু করলো ধীর-পায়ে পায়চারি।

প্রায় আধ ঘণ্টা...হঠাৎ দেখে, পাঁচিলের ওদিক থেকে তারি বয়সী একটি ছোকরা ঢুকলো বাগানে। ঢুকে সে এলো জহরের কাছে এগিয়ে। জহরকে লক্ষ্য করেই যেন এগিয়ে এলো...সেই বলির জায়গায়...শ্বেত-পাথরের কাছে।

তার ভাব-গতিক দেখে জহর অবাক! যেভাবে লোকটা এলো, বেশ স্বচ্ছন্দ গতি! এ-আসার জন্য কারো কাছে যেন তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না—আপন-অধিকারেই সে এসেছে যেন তাদের জমিতে!

জহর তাকে প্রশ্ন করলে—কি চান?

লোকটা তার পানে তাকালো...দুচোখে অবজ্ঞার দৃষ্টি!

জহর বললে—জবাব দিন...এখানে আপনি কাকে চান?

সে বেশ স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে বললে—কাকেও নয়।

—তাহলে এখানে আসার কারণ?

—তোমাকে যদি না বলি?

আশ্চর্য্য! একেবারে 'তুমি' বলে কথা কয়! ভদ্রতার ধার ধারে না, অথচ পরণে ভদ্র-পোষাক।

জহর বললে—না বললে আপনাকে আমি বেরিয়ে যেতে বলবো। কারণ এটা সরকারী পার্ক নয়, পথ নয়...এ জমি হলো আমাদের।

তাচ্ছল্য-ভরে সে হেসে উঠলো···উচ্চ হাস্য···তারপর বললে—ও···তুমি বুঝি চুণীলালবাবুর ছেলে? তাই এমন গোঁয়া মেজাজ!

টিট্‌কারী শুনে জহরের গা জ্বলে উঠলো—তবু সে-রাগ চেপে রেখে ভ্রূকুটি-ভরে জহর শুধু বললে,—হ্যাঁ।

—বুঝেছি···বিষ নেই তবু কুলোপনা চক্কর! তাহলে শুনে রাখো, আমার নাম ফতেচাঁদ। আমার বাবার নাম উমিচাঁদ। এ ভিটে, বাগান···সব এখন আমার বাবার। আমার বাবার কাছে তোমার বাবা টাকা ধার করেছিল, সে-টাকা শোধ দিতে পারেনি—আইনের জোরে এ বাড়ী-বাগান এখন তাই আমাদের হয়েছে।

তার এ স্পর্দ্ধিত কথায় জহরের আপাদমস্তক আরো জ্বলে উঠলো! তবু রাগ সম্বরণ করে জহর বললে—কিন্তু এখনো ছ'দিন বাকী আছে এ ভিটে-বাগান-জমি আপনার বাবার হতে। ছদিনে আপনার বাবার টাকা আমরা শোধ দেবো না···এমন কথা খোলশা পাকা করে' আমরা বোধ হয় জানাইনি এখনো!

—হোঃ-হোঃ-হোঃ! সে বিকট হাস্য করে উঠলো।

চোখ রাঙিয়ে জহর বললে—ঢের হয়েছে, সরে পড়ুন আপাততঃ···ছ'দিন পরে আসবেন এখানে। এখন যান, চলে যান···বলছি···

—ইস্! খুব যে দেখি ফণা তুলছো! ঢোঁড়া সাপের

ক্ষণাকে আমি গ্রাহ্য করি না। তোমার কথায় আমি আসিনি এখানে যে তোমার কথায় চলে যাবো!

—তার মানে?

—আমি এসেছি আমার বাবার কথায়। ভিটে, বাগান এগ্‌জামিন করতে···কোনো খান্‌ থেকে একখানা ইট সরেছে, কিম্বা কাঠ নড়েছে···গাছ কাটা হয়েছে কি না···সব দেখে-শুনে লিষ্টি তৈরী করতে!

জহর বললে—তা যদি এসে থাকেন তো সদর দিয়ে বাড়ীতে ঢুকুন ভদ্রলোকের মতো। ভাঙ্গা পাঁচিল টোপ্‌কে পরের জমিতে ভদ্রলোক প্রবেশ করে না···এ-পথে আসে শুধু তারা···যারা চোর···ছিঁচ্‌কে চোর!

—ইস্‌, ভারী লম্বা লম্বা কথা বলছো যে, দেখছি। দেনার দায়ে বাপ ওদিকে পায়ে লুটিয়ে পড়ছে···আর ছেলে ফর্‌ফরাচ্ছে ছাখো! কথা নয়···যেন ম্যাক্সিম্‌-গান ছুড়চে!

—তবে রে ছুঁচো, আমার বাবাকে অপমান!

বলে দুরন্ত বাঘের মতো ফতেচাঁদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো জহর।

বাবু-মানুষ ফতেচাঁদ। চেহারাই যা হোঁৎকা! ঘী-দুধ খেয়ে শরীরটাকে বেলুনের মতো শুধু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে, একরত্তি শক্তি নেই ও দেহে। জহরের চাপে মাটিতে সে লুটিয়ে পড়লো এবং জহর তাকে ঠেলা দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেললো ছোট্ট একটা পগারের মধ্যে। রাত্রের বৃষ্টিতে

পগার ছিল জলে ভর্ত্তি···ঠেলে দিয়েই জহর সরে এসে দাঁড়ালো।

জলে-কাদায় চুবন খেয়ে ফতেচাঁদ যখন পগার থেকে উঠলো, তখন তার যা মূর্ত্তি···দেখে জহরের পক্ষে হাসি চাপা দায় হলো! হেসে সে বললে—নমস্কার মিষ্টার জলহস্তী! ব্রেভো জলহস্তী···

—হুঁ! বলে ফতেচাঁদ ফিরে দাঁড়ালো।

জহর বললে—মাপ করবেন মশাই···ও-বেশে পথে যাবেন না, মোষওলারা তাহলে মোষ ভেবে ধরে নিয়ে গিয়ে এখনি তাদের গাড়ীতে জুতে দেবে। বাড়ীতে আসুন, গা ধুয়ে ফর্শা শুকনো কাপড় পরে তারপর বাড়ী যাবেন। একখানা শুকনো কাপড় দয়া করে' আপনাকে পরতে দেবো'খন।

—হুঁ! আমি ভিখিরী? বটে! আচ্ছা! এর ফল কি হয়, এর পর দেখে নিয়ো। আমি দেনদার নই···পাওনাদার উমিচাঁদের ছেলে আমি···আমার নাম ফতেচাঁদ!

কথাটা বলে বিপুল আক্রোশে ফতেচাঁদ ফিরে গেল ···যে-পথে বাগানে ঢুকেছিল, সেই পথ ধরে।

জহর দাঁড়িয়ে রইলো হতভম্বের মতো।

অনেকক্ষণ···

বাতাসের মৃদু দোলা···গাছে-গাছে পাখীর কূজন···দূরে পথ-চলা পথিকের কণ্ঠে গানের কলি···বনের গুল্ম-লতার একটা

"নমস্কার মিষ্টার জলহস্তী।"

[পৃঃ ৪৮

মিশ্র গন্ধ···মাথার উপর নির্ম্মল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ···জহরের মনে হচ্ছিল, শত কাজে মগ্ন থেকে দেশের এ ভিটে···জমি-বাগান···এ-সবের পানে কোনোদিন তাকাবার অবকাশ হয়নি তার! ভিটেকে মনে করেছে ইট-কাঠ দিয়ে তৈরী আচ্ছাদন···মাথা গোঁজবার আশ্রয়···কাজের পর খানিকটা সময় বিশ্রাম চাই সেই বিশ্রামটুকু নেবার জায়গা শুধু। ভিটের সঙ্গে সজীব মনের কতটুকু বা সম্পর্ক।···এখন এই রৌদ্র-বাতাসের স্পর্শে···বনের ঐ গন্ধে মনে হতে লাগলো, এ-ভিটে ইট-কাঠের স্তূপমাত্র নয়···বাগান শুধু দুটো ফুল-ফল ফলাবার জমি নয়। মায়ের কোলে একদিন যে স্নিগ্ধ আরাম, বরাভয় শান্তি অনুভব করেছে···মায়ের বুকে স্নেহ মমতার যে অসীম মায়া···মায়ের বুকের সেই স্নেহ আর মায়ের কোলের সেই আরাম···এই ভিটেয় জমে আছে অজস্র বিপুল হয়ে! এ-ভিটের দাম টাকা-পয়সায় কষা যায় না।

কলকাতার হোস্টেলের কথা মনে পড়লো···ভাড়া-করা ঘর···শত অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও সেখানে পড়ে থাকতে হয়! আর এখানে কি মধুর স্বাচ্ছন্দ্য···কতখানি আরাম!

না···না···না···এ-ভিটে রক্ষা করতেই হবে! হবে···হবে···হবে।

মন তখনি অবসাদে ভরে' কেঁদে লুটিয়ে পড়লো···কেমন করে? হায়, কেমন করে রক্ষা হবে?

এমনি স্বপ্নময় তার ভাব···

মহেশ এসে ডাকলো—দাদা···

চমক ভাঙলো। জহর ফিরে তাকালো, বললে—মহেশদা···

—হ্যাঁ, বাবা ডাকছেন!···তুমি না-কি কি করেছো···ঐ উমিচাঁদ এসেছে বাবার কাছে তার নালিশ নিয়ে।

—বটে! চলো···

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঁটুল উমিচাঁদ

একরাশ খাতাপত্রের মধ্যে বসে আছেন চুনীলাল তক্তা-পোষের বিছানার উপর…আর তাঁরি পাশে যেন একখানা ম্যান্-অফ্-ওয়ার…তেমনি প্রকাণ্ড দেহ একটি মানুষ। যেমন মোটা, তেমনি বেঁটে। মানুষটির পরণে মোটা ধুতি…কোনো মতে হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতিতে ঢাকা পড়েছে…পায়ে শক্তালি-দেওয়া চিপসী একজোড়া নাগরা…গায়ে হাতকাটা বেনিয়ান এবং মাথায় চাউশ পাগড়ি। সাদা একটা থান কেটে এ পাগড়ি তৈরী করিয়েছিল বোধ হয় এঁর কোনো পূর্ব্বপুরুষ সেই নবাব আলীবর্দ্দির আমোলে! তারপর কস্মিন্‌কালে কাচা হয়নি, কাজেই মাথার তেলে পাগড়ির চেহারা যা [illegible] পাগড়ির পানে তাকালে সারা শরীর ঘিনঘিনিয়ে [illegible]। গায়ের বেনিয়ান ভুঁড়িকে চেপে-চেপে [illegible] আছে যে মানুষটির মুখ আর মাথা যদি [illegible] তাহলে মনে হবে, ময়লা ওয়াড়-পরানো মোটা তাকিয়া! …ইনিই এ-অঞ্চলের বিখ্যাত মহাজন মালচাঁদের পৌত্র এবং মূলচাঁদের পুত্র উমিচাঁদ।

জহর এসে দাঁড়ালো তক্তাপোষের [illegible] উদ্দেশ করে' বললে—আমায় ডেকেছেন ?

চুণীলাল চাইলেন জহরের পানে। অপ্রসন্ন মুখ, বিরক্তি-ভরা দৃষ্টি। চুণীলাল বললেন—হ্যাঁ, বসো।

জহর বসলো। বসে চকিতের জন্য তাকালো বেঁটে মোটা উমিচাঁদের পানে। উমিচাঁদ তখন কাৎ হয়ে বসেছে—প্রসারিত বাঁ হাতে একরাশ নস্যি...ডান হাতের দু'আঙুলে তার খানিকটা নিয়েছে টিপে এবং নাকের মধ্যে সবেগে সেই নস্যি-ভরা আঙুল দিলে গুঁজে...নাকের সে-ফোকর দেখাচ্ছে যেন সাপের গর্ত! তারপর বাঁ-হাতে এক-নাক চেপে অপর নাকের মধ্যে নস্যি-ভরা আঙুল গুঁজে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভঙ্গী যা করলো...কিম্ভূত দৃশ্য! দেখে জহর তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আবার চুণীলালের পানে তাকালো।

চুণীলাল বললেন,—তুমি বাগানে ছিলে?

—হ্যাঁ।

—উমিচাঁদ বাবুর ছেলে ফতেচাঁদ সেখানে গিয়েছিল...তুমি তাকে ঠেলে পগারে ফেলে দিয়েছো?

জহর চাইলো উমিচাঁদের পানে—নাসারন্ধ্রে নস্যি ঠাশা শেষ করে উমিচাঁদ কুৎকুতে চোখ দুটো মেলে জহরের পানে তাকিয়ে......নাকের নীচে, ঠোঁটে ভিজে নস্যি একেবারে ব্যাজ্‌ব্যাজ্ করছে!

জহর বললে—সে যে উমিচাঁদবাবুর ছেলে, তা জানতুম না। উমিচাঁদবাবুর ছেলে সদর দিয়েই বাড়ীতে আসবে জানি। তা নয়...ভাঙ্গা পাঁচিল টোপ্‌কে এসেছিল। আমি ভেবেছিলুম,

বুঝি চোর-ছ্যাঁচোড়। তাকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলুম, তখন সে দিলে তার পরিচয়···তারপর পরিচয় শেষ করে' হঠাৎ আমার বাবাকে কতকগুলো অপমানের কথা বললে। সে অপমান সয়েছিলুম কোনোমতে,—শুধু অপমান করতে মানা করেছিলুম। তাতে সে আরো বাড়াবাড়ি করে, কাজেই তাকে তার বেয়াদবির সাজা দিয়েছি। তাও মার-ধোর করিনি, শুধু ঠেলে দিয়েছিলুম···সে-ঠেলায় একটা খানার মধ্যে সে পড়ে গিয়েছিল···অত-বড় হাতীর মতো দেহ,···ও দেহে আমার ধাক্কা সইবে না, তা আমি ভাবিনি!

কথাটা বলে জহর চাইলো উমিচাঁদের পানে; চুনীলালও চাইলেন।

উমিচাঁদের কুৎকুতে চোখ দুটো এ-কথায় কুঁচকে গেল··· দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে বললে—এম্-এম্-এম্···যদি ত্-ত্-আর ন্-ন্-ন্ আক্ ভাঙ্গিয়ে য-য-য-এতো?

লোকটিকে বিধাতা শুধু বদ-চেহারা দিয়েই খুশী হননি··· তোৎলাও করেছেন!

কোনোমতে হাসি চেপে জহর বললে—কিন্তু ন্-ন্-ন্-আক্ ভ্-ভ্-আঙ্গিয়ে যায়নি তো!

চুনীলাল গভীর দৃষ্টিতে চাইলেন ছেলের পানে···জহর বুঝলো, তোৎলাকে ভ্যাংচানো বাবা পছন্দ করছেন না।

উমিচাঁদ বললে—অ-অ-অপনি ওন্যাই কোরিয়েছেন। চ্-চ্-উনিলালবাবু দোস্ত আছে···একদিন রূপেয়া দ্-দ্-দ্-ইয়ে

হামি উপ্‌কার ক্‌-ক্‌-অরিয়েছে···ঔর ফ্‌-ফ্‌-অতেচাঁদ হামারি ল-ল্‌-ল্‌-এড়কা···বাচ্ছা তো !

জহর বললে—আমি যদি ফতেচাঁদকে বলতুম, তোমার বাবা জোচ্চোর, তোমার বাবা লক্ষ্মীছাড়া, তোমার বাবা বেঁটে মর্কট, বদমায়েস, তাহলে ফতেচাঁদ আমায় ছেড়ে দিত ?

উমিচাঁদ বললে—ক্‌-ক্‌-ক্‌-ইস্ত আপুনি কেনো তা বোলবেন ? হামি জ্‌-জ্‌-উয়াচুরি কাম্‌ ভি কখনো ক্‌-ক্‌-অরিনি ! ভোদ্দোর আদমি···

জহর বললে—ফতেচাঁদও তো ভোদ্দোর আদমি ! ছোটা আদমি নয়।

বিরক্তি-ভরে উমিচাঁদ কপাল কুঁচকে বললে—না-না-না··· আপনি ওন্যাই কোরিয়েছেন···ওপোমান।

জহর বললে—আমার বাবাকে সে অপমান করবে আর আমি তাকে ছেড়ে দেবো—এ হতে পারে না উমিচাঁদবাবু। তাকে মানা করে দেবেন···বলে দেবেন, আমার বাবাকে যদি ফের অপমান করে, তাকে আমি কখ্‌খনো ছেড়ে দেবো না। এমন কি, আপনি অপমান করলেও আমি ছেড়ে কথা কইবো না, আপনাকেও সাজা পেতে হবে, জানবেন।

উমিচাঁদ দেখলো, ছোকরা কলকাতায় লেখাপড়া করলে কি হবে, জোয়ান চেহারা···মুখের কথাও ভারী স্পষ্ট এবং জোরালো···তাই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দেবার উদ্দেশে উমিচাঁদ চাইলো চুনীলালের দিকে, বললে—য্‌-য-য-এতে দিন্‌ বাবু···

ছেলিয়ায়-ছেলিয়ায় ক্-ক্-ক্-এঞ্জিয়া অমন হুয়ে থাকে ! ঔর হোবে না। ক্-ক্-ক্-এমন ব-ব-ব-আবু-সাব ?

প্রশ্নটা নিক্ষিপ্ত হলো জহরকে উদ্দেশ করে।

জহর বললে—আপনার ফতেচাঁদকে হুঁশিয়ার করে' দেবেন। বলবেন, ভোদ্দোর-মানুষের বাড়ী এসে যেন ভোদ্দোর্ত্তা রাখে, তাহলে আর কেঞ্জিয়া হবে না।

—ব্যস্···ব্যস্···ব্যস্!

উমিচাঁদ যেন পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচলো! তারপর সে চাইলো চুনীলালের পানে। বললে—(তোৎলামির ভাষা আমরা বাদ দিলুম) তাহলে আমি আসছি বেলা পাঁ'চটার সময়···নীচের তলায় দু'তিনটে কামরা হলেই চলে যাবে। আমি আসবো··· আমার ছেলে ফতেচাঁদ আসবে···আমার সরকার···গোমস্তা··· ঔর আমার ভগ্নীপতি কণ্ট্রাক্টর বুলাকীলাল···ব্যস্!

জহর বললে—কণ্ট্রাক্টর কেন ?

উমিচাঁদ বললে—মাপ কষে দাম কষে নেবে বাবু।··· দলিলে লিখা আছে, রূপেয়া যখন করজ্ দেওয়া হোয়, তেখন বাড়ী-ঘরের মাপজোপ দর-দাম সব কষিয়ে লিখাপড়া হইছিল ···তার থেকে দর-দাম কেতোখানি কেম্‌তি হলো···কি-কি নোষ্ট হইছে···ইট-কাঠ বৃদ্দি হইছে···সব দেখে-শুনে লিবার কথা। দশটি হাজার···ঔর তার সুদ···সব-সমেত পনেরো হাজার রূপেয়া বুঝে লিতে হোবে হামাকে। এই কোঠী ঔর কোঠীর মাল-মশলা লিয়ে তারি মাপ-জোপ করতে

কোনট্রাক্‌টরের কাম্‌ আছে—দলিলে এ্যায়সা লিখা আছে··· হামি জুলুম কোরছি না বাবু-সাব···

কথাটা উমিচাঁদ বললে বেশ সতেজে। শুনে জহর চাইলো চুণীলালের পানে।

এ দৃষ্টির অর্থ চুণীলাল বুঝলেন···বললেন—দলিলে লেখা আছে, ওঁরা দখল নেবার সময় সব দেখেশুনে বুঝেসুঝে নেবেন···পনেরো হাজারের চেয়ে দাম কম হলো কি না।

জহর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলো না, বললে—এই বাড়ী, বাগান, পুকুর, সমস্ত জমি···এর দাম মোটে পনেরো হাজার টাকা?

উমিচাঁদ তার কুৎকুতে চোখ দুটো আবার কুঁচকে ক্ষণেকের জন্য চেয়ে রইলো জহরের পানে···দৃষ্টিতে যেন ছুঁচের ফলা!

উমিচাঁদ প্রশ্ন করলো—কেতো দাম, আপনি বোলিয়ে দিন···

—পঞ্চাশ হাজার টাকার এক পয়সা কম নয়! প্রায় দুশো বিঘে জমি···বলেন কি আপনারা! আর ঐ আম-বাগান ···যত ভালো ভালো আম···

—হাঃ-হাঃ-হাঃ! উমিচাঁদ উচ্চ হাস্য করে উঠলো, তারপর বললে—কলকাতা সহরে থাকেন বাবুসাব···কলকাতার দর-দাম বোলছেন···লেকেন, এ কলকাত্তা সহর নয়···মেহদীপুর ···বুনো জায়গা। ইখানে কেউ এর জন্য দশ হাজার রূপেয়া ভি দিবে না!

জহর বললে—আপনি মহাজন, একটি পয়সার দাম বোঝেন—আপনি তবে পনেরো হাজার টাকায় নিচ্ছেন যে?

—দোস্তি, বাবুসাব। চুণীলালবাবুর দোরকার হইছিল দশ হাজার রূপেয়া। ঔর সুদ···ইস্ লিয়ে পনেরো হাজার দে' দেতা।

—হুঁ! কিন্তু দিন-কাল বদলে যাচ্ছে উমিচাঁদবাবু। এ-সব জায়গা পড়ে থাকবে না। এখানকার মাটীও ওজন-দরে বিক্রী হবে···আজ না হয়, দু'চার বছর পরে।

উমিচাঁদ বললে—দু'চার বছর পরে বাণের জলে ডুবে যেতে ভি পারে···ভুঁইকম্প হোলে সব তলিয়ে ভি যাতি পারে! হাঃ হাঃ হাঃ!

বেয়াদবটার কথায় জহরের গা জ্বলে যাচ্ছিল···ইচ্ছা হচ্ছিল, ঐ ফোলা গালে ধাঁইসে মারে এক থাবড়া! কিন্তু বাবা বসে আছেন···তাছাড়া বাবাকে একদিন টাকা ধার দিয়ে মস্ত উপকার করেছিল···কাজেই মনের ঝাল মনে চেপে রাখা ছাড়া উপায় নেই!

উমিচাঁদ এবার চাইলো চুণীলালের পানে, বললে—তাহলে কথা রইলো, বিকালে হামি আসছে···হিসাব কোরতে দু'চার রোজ কোন্ না লাগবে, কি বোলেন চুণীলালবাবু?

নিরুপায় হতাশ্বাসের ভঙ্গীতে চুণীলাল বললেন—আসবেন।

—এক-তলায় দো-চার কামরা হোলেই হামার চলিয়ে যাবে···খাওয়া-দাওয়া ঔর রাতমে শোয়া···দিনমে সব মাপ-জোপ—ব্যাস্!

জহর তাকালো চুণীলালের পানে, বললে—আমি তাহলে আসতে পারি ?

চুণীলাল বললেন—এসো। মোদ্দা···এঁর ছেলে এলে তাকে একটু সামলে চলো জহর। পাওনাদার···তার একটু রোখ তো হবেই, বাবা।

জহর ফোঁশ করে উঠলো—রোখ আবার কিসের! টাকা ধার দিয়েছিল, আমরা কড়াক্রান্তি হিসাবে তার সে ধার শোধ দিচ্ছি! ভিক্ষা চাইনি আমরা। ওঁরাও দয়া-দাক্ষিণ্য করছেন না! কাজেই চাল দেখাতে এলে আমি তা বরদাস্ত করতে পারবো না। বিশেষ আপনার সম্বন্ধে যদি একটা বেয়াদবির কথা বলে···আমার উপর যত রাগই করুন, আমি তা কক্‌খনো সইবো না চুপ করে'।

কথাটা বলে জহর চাইলো উমিচাঁদের পানে। উমিচাঁদ জহরের পানে চেয়েছিল, তার কথা সে বুঝেওছে বেশ সুস্পষ্ট রকম।

উমিচাঁদের পানে তাকিয়ে জহর বললে—একটা কথা উমিচাঁদবাবু···

উমিচাঁদ বেশ সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিলে—একটা কেন বাবু-সাব, দশটা কুথা বলবেন—আপনার বাবা হামার দোস্ত!

জহর বললে—দশটা কথা বলবার মতো সময় আমার নেই, একটা কথাই বলে রাখি। সে-কথা ঃ আপনার ছেলেকে বুঝিয়ে দেবেন, এখানে ছ'দিন এখনো আমরা মালিক···এ-

ছ'দিন আপনারা অতিথির মতো থাকবেন। আপনারা দয়া করতে বা ভিক্ষা দিতে আসছেন না! এখানে ভদ্দর মানী আদমির বাস। এখানকার মানী-আদমির মান রেখে যেন সে চলে! একটু অপমান করলে, আমি ছেড়ে দেবো না···আমার হাতে জোর আছে, রোজ এক্সারসাইজ করি, আমাকে যেন রাগ করবার সুযোগ সে না দেয়!

ব্যস্ত হয়ে উমিচাঁদ বললে—আরে না, না, না! ফতেচাঁদ বে-আন্দাজ কুছু কোরবে না। কাকেও সে ওপমান করবে না।

—তাহলে তার কোনো ভয় নেই আমার হাতে···

এ-কথা বলে জহর গমনোদ্যত হলো···দরজা থেকে বেরুতেই দেখে, সামনে মহেশদা। বললে—কি খবর মহেশদা?

মহেশ বললে—কাশেম সাহেব ফিরেছে, বাগানে অপেক্ষা করছে।

—ও···চলো।

বাগানে কাশেমের সঙ্গে দেখা। কাশেম বললে—এ-বেলায় তারা আসতে পারবে না। বললে, বলেন যদি, রাত্রে কাজ করতে পারি।

কথাটা জহরের মনে যেন বিদ্যুতের আলো ফুটিয়ে দিলে। মন্দ কি! জহর বললে—বেশ, ভালো কথা। গভীর রাত্রে··· নিঃশব্দে···কেন না, উমির্চাদ আজ বিকেলে সদলে আসছে··· এই বাড়ীতেই ক'দিন ওরা থাকবে।

আশ্চর্য্য কণ্ঠে কাশেম বললে—সত্যি ?

—হ্যাঁ। দলিলে নাকি এমনি কথা লেখা আছে। বাবা যখন তাতে সায় দিলেন···

কাশেম বললে—বেশ, তাহলে তুমি এসো। আমরা ওদের সঙ্গে কথা কয়ে···

জহর বললে—দুটি লোক নিয়ে কাজ করবো কাশেম! বুঝছি, মিথ্যা চেষ্টা···তবু!

কাশেম বললে—আমিও তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।

—থেকো···কিন্তু আমাদের এ-অভিযানের কথা কাকেও বলবো না। বাবা জানবেন না, রহিম-চাচাও নয়।

—তাই হবে। তুমি এখন এসো আমার সঙ্গে···আয়োজন করা যাক।

—চলো।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিশাচর

বৈকালে উমিচাঁদের আবির্ভাব! জহর পাশ কাটিয়ে রইলো। চুণীলাল করলেন অভ্যর্থনা। মাথা তাঁর মাটীর নীচে নেমে যাচ্ছিল যেন! দেনদার হলে মানুষ কি করে' তার মনুষ্যত্ব বজায় রাখবে? তবু দেনা করে' সে-টাকা তিনি ফাঁকি দিচ্ছেন না! সামান্য দেনার দায়ে পাওনাদারের হাতে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব তিনি তুলে দিচ্ছেন! পাওনাদারটা দিব্যি বুক ফুলিয়ে তার পাওনার চেয়ে অনেক বেশী আদায় করতে এসেছে···এতটুকু দ্বিধা নেই, চক্ষুলজ্জা নেই! এত বড় বেহায়া!

জহর ভাবছিল, পাওনাদার হলেই কি মানুষ এমন নির্লজ্জ হতে পারে···মানুষের কোঠায় তার ঠাঁই হবে না? ন্যায়-ধর্ম্ম কথাটা বইয়ের পাতাতেই শুধু লেখা থাকবে? দুনিয়ার যেটুকু পরিচয় এ-বয়সে সে পেয়েছে, তার কোথাও এতটুকু ন্যায়-ধর্ম্মের চিহ্ন দেখেনি! কলেজে নয়···ইউনিভার্সিটিতে নয়···অথচ সে হলো বিদ্যা-মন্দির···জ্ঞানী-গুণীরা সেখানে বসেছেন মানুষকে জ্ঞান-বিতরণের জন্য! মনে পড়লো সহপাঠী হরলালের কথা —ইউনিভার্সিটির এক দিগ্‌গজ ফেলোর ছেলে···তার বিদ্যা-বুদ্ধি কারো অজানা নয়···অথচ বাপের খাতিরে সে পেয়ে গেল

সেকেণ্ড গ্রেড্ স্কলারশিপ···ক্লাশ-এগ্জামিনেশনে কোনোদিন একটি ছত্র লিখতে বসেনি। শিক্ষিত সমাজেই যখন এমন··· তখন এ-তো একটা স্বার্থপর, অর্থলোভী মহাজন!

কিন্তু এ-সব আলোচনায় লাভ কি? সদুপদেশ কেন, চোখে আঙুল গুঁজে এ-সব লোকের কাছে ন্যায়-ধর্ম্মের দিকটা দেখিয়ে দিলেও এরা তা দেখবে না! পয়সার উঁচু গদিতে যারা বসে আছে, তারা কেতাব, কেতাবী বুলি আর পরের মুখ···এর কোনোটার পানে তাকায় না! জানে, পয়সার জোরে সব-কিছু তারা আদায় করবে! পয়সার জয় কোথায় নয়? কত জুয়াচোর-বাটপাড় শুধু টাকার জোরে রায়-বাহাদুর খেতাব নিয়ে সমাজে শিরোমণি হয়ে বসে আছে···জন-নেতা হয়ে পাদ্য-অর্ঘ্য আদায় করছে! তাদের সম্মানের কি সীমা আছে! টাকার জোরে শুধু জেলের মধ্যে ঢুকতে হয়নি। অথচ যাদের টাকার জোর নেই, ওদের চেয়ে ছোটখাট জুয়াচুরি করে, তারা জেল খাটছে! দুনিয়ার বিধিই উল্টো রকম!

ভাবলো, কবে···কবে এ অধর্ম্ম, এ অন্যায়ের অবসান হবে? ন্যায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা মানুষ কবে আবার রক্ষা করে চলতে শিখবে? তা যদি কখনো হয়, সেদিন আর আইন-আদালত, দলিল-দস্তাবেজ···পুলিশ-জেলখানা···এ-সবের চিহ্নও থাকবে না দুনিয়ায়! দুনিয়ার আগাগোড়া ইতিহাসখানা যেন জহরের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো! জহর দেখলো, যত দিন যাচ্ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত উৎকর্ষ হচ্ছে, মানুষ ঠিক সেই

পরিমাণে অসাধু হচ্ছে···অত্যাচারী হচ্ছে···অন্যায় করবার স্পর্দ্ধায় নিঃশঙ্ক, প্রমত্ত হয়ে উঠছে!

সূর্য্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ···রাত্রি। ঘড়িতে নটা বাজলো। মহেশ এসে ডাকলো—দাদা···

চিন্তার গহন থেকে ফিরে জহর তাকালো মহেশের দিকে। বললে—ডাকছো?

—হ্যাঁ। খাবার তৈরী···বাবা ওদের সঙ্গে খাতাপত্র নিয়ে যেভাবে বসেছেন, তিন-তিনবার গিয়েও তাঁর হুঁশ করাতে পারলুম না। আমি বলি, খেয়ে-দেয়েই না হয় খাতা নিয়ে বসতেন!

জহর বললে—খাতাপত্রের ভড়ংই বা কেন, মহেশদা? ওরা তো লুঠতে এসেছে, খাতা বার করলে দু'পয়সা যেমন কমবে না আমাদের দিকে···ওরাও তেমনি একখানা ইট তো বেশী পাবে না। তবে?

মহেশ বললে—কে জানে! তাই বলছিলুম দাদা, তুমি গিয়ে বাবাকে ধরে আনো—দুজনে খেয়ে নাও।

জহর বললে—যাচ্ছি।

মহেশ চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ আবার ফিরলো। ফিরে জহরের দিকে তাকিয়ে বললে—কাশেম সাহেব এসেছিল। বলে গেল, বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া সেরে কুলি-দুজনকে নিয়ে চুপি চুপি

আসবে সাড়ে দশটা নাগাদ···আর ওরা আসবে ঐ বাগানের পথ দিয়ে খিড়কীর দিকে।

জহর বললে—এ-কথা যেন কেউ না জানতে পারে মহেশদা ···দেখো···বাবাও না! জানি, সব মিথ্যা···তবু···তোমরা সকলে বলছো···যোদ্দা ঐ বেঁটে-মর্কটরা এসেছে···ওরা না কিছু টের পায়!

আশ্বাস দিয়ে মহেশ বললে—না, না···সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দাদা। খেয়ে-দেয়ে তুমি চলে যাও তোমার ঘরে···গিয়ে বই নিয়ে বসে পড়াশুনা করোগে···আমি ঐ খিড়কীর দোরে থাপটি মেরে বসে থাকবো'খন।

—বেশ!

জহর এলো বাহিরের ঘরে···বাপ চুণীলালকে ঘিরে উমি-চাঁদের দল খাতা-পত্র খুলে বসেছে। উমিচাঁদ কথা কইছে চড়বড় করে'···দুটো চোখ যেন ভাঁটার মতো ঘুরছে। ফতেচাঁদ এক-খানা কেদারায় বসে পা দোলাচ্ছে। দেখলে মনে হয়, মনে-মনে কি যেন ফন্দী আঁটছে। বাপ চুণীলাল হতভম্বের মতো বসে আছেন! উমিচাঁদের মুখে নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি। আর কালো একটা ভোঁদাপানা মানুষ···যেন কালির বোতল···চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছে তক্তাপোষে···পা ছড়িয়ে চুণীলালের দিকে।

দেখে জহর রাগে জলে উঠলো! এই সব পথের কুকুর··· এত-বড় স্পর্দ্ধা যে চুণীলালের তক্তাপোষে চড়াও হয়েছে

"একটু অপমান করলে, আমি ছেড়ে যেবো না।"

[পৃঃ ৫৯

এমন করে’! অথচ দুদিন আগে চুণীলালের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানো কি, পায়ের কাছে ঘেঁষবার সাহস ছিল না এদের!

জহর এসে সেই কালির বোতলটাকে দিলে গুঁতো। বললে—এই বাবুজী, উঠে বসো, উঠে বসো···এটা তোমার গদি নয় যে হাত-পা ছড়িয়ে আয়েস করবে। আমাদেরও বসতে হবে।

হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে লোকটা কেমন হক্‌চকিয়ে গেল! এবং তখনি কাৎ হয়ে এক-পাক ঘুরে খাড়া উঠে বসলো। মুখখানা যেন সেই রামলীলায়-দেখা কুম্ভকর্ণের মুখোশ! চোখ দুটো বড়-বড়···হঠাৎ দেখলে মনে হয়, গোরুর চোখ! উঠে বসলো সে অত্যন্ত অপ্রসন্ন ভাবে।

উমিচাঁদ এ-ব্যাপার লক্ষ্য করলো···ফতেচাঁদও। কিন্তু দুজনেই চিনে ফেলেছে জহরকে। ফতেচাঁদ প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছে জহরের মেজাজের; আর উমিচাঁদ শুনেছে ও-বেলায় জহরের মুখে জোরালো কথা···এবং চক্ষে দেখেছে তার দু-হাতের ইয়া গুলি! কাজেই দুজনের চোখে ফুটলো যেমন আতঙ্ক, তেমনি বিস্ময়-মেশানো দৃষ্টি। দুজনের মুখ শুধু ব্যাদানিত হলো···কারো মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না কিন্তু।

কালির বোতলও স্পীক্-টী-নট্। জহর মনে-মনে হাসলো, বললে,—ভদ্দরলোকের আসরে কি করে বসতে হয়, তাও শেখোনি! বয়স তো দেখছি বহুৎ বেড়েছে! পা গুটিয়ে বসো কর্ত্তা···

তারপর চুণীলালকে উদ্দেশ করে বললে—খাবার তৈরী বাবা। আমার ভারী খিদে পেয়েছে···চলুন, আমরা খেতে যাই।

চুণীলাল বললেন—কিন্তু এঁদের এই সুদের হিসেবটা···

জহর ফোঁশ করে উঠলো। বললে—সুদের আবার হিসেব কি! টাকা ধার দেবার সময় কড়া-ক্রান্তি হিসাব কষে খত-দলিল লিখিয়ে নেছে! এখন এসেছে সেই শাইলক্-জুয়ের মতো পাউণ্ড অফ্ ফ্লেশ্ নিতে···দলিলে যেমন লেখা আছে, তাই নেবে।

তারপর সে চাইলো উমিচাঁদের দিকে। চেয়ে বললে—কি বাবুজী, সুদ কষছো কেন আবার? দলিলে লেখা আছে—পনেরো হাজারে বাড়ী দখল। সুদ যদি পাঁচ হাজারের কম হয়ে থাকে···দেবে সে টাকা ফেরত? না, সুদ যদি হিসেবে বেশী দাঁড়ায় তো নেবে আমাদের গায়ের চামড়া খুলে? তা তো পারবে না মুশই···দলিলে চামড়ার কথা লিখা নেই! লিখা আছে শুধু এই ভিটে···মায় বাগান-পুকুর-জমি সমেত!

উমিচাঁদের মনটা গরগর্ করে উঠলো। ভেবেছিল, সুদের হিসাবে আরো কিছু বেশী দেখিয়ে বাড়ন্ত যদি সিল্কের কারবারটাতেও ছোঁ মারতে পারে! কিন্তু জহরলালের যে মেজাজ···তাই সে শুধু উচ্চ হাস্য করে বলে উঠলো,—হা, হা, হা, বাবুজী লিখাপড়া শিখেছেন কিনা···তাই চমৎকার বুঝিয়ে

কথা বলতে পারেন। হা, হা, হা! তা হলে চুণীলালবাবু··· খাবার তৈরী, খেয়ে-দেয়ে আবার বসবেন'খন।

চুণীলাল বললেন—আপনাদেরও তো খাওয়া-দাওয়া আছে উমিচাঁদবাবু?

—না! দহি-বড়া আছে কয়ঠো···ঔর থোড়া চানা, ব্যস! খাবার সাথে লিয়ে আস্‌ছি বাবুজী।

জহর বললে—তাই? না, পাঁচজনের ভিটে-মাটি বাগান সম্পত্তি খেয়ে-খেয়ে পেটে আর পুরী-মিঠাই ঠাশ্‌বার জায়গা নেই?

—হা, হা, হা! আবার সেই উচ্চ হাস্য। উচ্চ হাস্যরোল তুলে উমিচাঁদ এ শ্লেষটুকু তারি ফুৎকারে উড়িয়ে দিলে!

চুণীলালের এ-সব ভালো লাগছিল না। আসন্ন বিপদের ব্যথায় তাঁর মন কেমন নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠেছিল···মনে শুধু তীব্র অনুশোচনা! তিনি ভাবছিলেন, ব্যবসার লোভে পূর্ব্ব-পুরুষের বাস্তু বন্ধক দিয়ে যে মহাপাপ করেছি, জানি না, সে পাপের শাস্তি এইখানেই শেষ হবে কিনা! মনে হচ্ছিল, ব্যবসার জন্য বাস্তু বন্ধক না দিয়ে যদি এখানে এসে বাস করতুম···ঐ বাগানে প্রজা-বিলি করতুম···জমিতে চাষ-বাস করতুম···তাহলে আজ এমন সর্ব্বহারা হতে হতো না! এত টাকার কি-বা প্রয়োজন ছিল আমার?

পাছে জহর আরো কিছু অপ্রিয় প্রসঙ্গ পেড়ে বসে, তাই তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে চুণীলাল

বললেন—চলো জহর…আমরা খেয়েই আসি! আর উমিচাঁদ-বাবু, আমার বাড়ীতে আপনারা অতিথি…নেহাৎ না খেয়ে থাকবেন…আমার মন এতে স্বস্তি পাচ্ছে না যে। যদি অনুমতি করেন, পুরী-টুরী তৈরী করিয়ে…

বদান্যতা দেখিয়ে উমিচাঁদ বললে—না, না, না চুণীলালবাবু …কুছু দোরকার নেহি। রাতের বেলা আমাদের এই চানা চিবিয়েই কাটলো চিরকাল…তার উপর দহি-বড়া আনিয়েছি। বুলাকী ছাতু এনেছে…ও খাবে ছাতু আর লঙ্কা…ব্যস্, ব্যস্, ব্যস্!

আহারাদির পর চুণীলালকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তিনি বললেন—না জহর…কথা দিয়েছি…হিসেব দেখবো। জানি, দেখে কোনো লাভ নেই, তবু কথা দিয়েছি, সে-কথার তো দাম আছে।

জহর বললে—বেশ…দেখুন খাতা। কিন্তু সাড়ে দশটা বাজলে আপনাকে ঘরে গিয়ে শুতে হবে…আমি কোনো ওজর শুনবো না তখন।

মৃদু হেসে চুণীলাল বললেন—আচ্ছা, সাড়ে দশটা বাজলেই চলে আসবো!

—ওরা শোবে কোথায়?

—বসবার ঘরের পাশে যে বড় ঘর…সেই ঘরে।

—আচ্ছা, আমরা এদিকটা কিন্তু বন্ধ করে' শোবো।

যত টাকা দামের মহাজন হোক ওরা···বিশ্বাস নেই! ছিঁচকে চুরির অভ্যাস ওরা এখনো ছাড়তে পারেনি, বাবা। ফতেচাঁদকে আপনি যদি দেখতেন···চোরের মতো তার বাগানে ঢোকা···নিশ্চয় ব্যাটার কোনো মতলব ছিল। বদ মতলব।

চুণীলাল বললেন—সে তো চুকে গেছে জহর। ও-কথা আবার কেন?

জহর বললে—আপনাকে শুধু বলে রাখছি···মানে, ঘরে ঠাঁই দেছেন, দিন···কিন্তু ওদের বিশ্বাস করবেন না। এসেছে একগাদা লোক নিয়ে! কেন, বলুন তো? কি দরকারে? ডাকাতি করবি নাকি?

হেসে চুণীলাল বললেন—আমাদের কি আছে যে ডাকাতি করবে!

জহর বললে—ওরাই জানে, কি আছে!

জহরলাল একখানা বই পড়ছিল···টেক্সট্ নয়···কবেকার পুরোনো একখানা মাসিক-পত্র। পড়ছিল একটা গল্প···কাশেম এসে চুপিচুপি ঘরে ঢুকলো, ডাকলো—জহর···

—কাশেম! তোমার জন্যই আমি বসে আছি! তারপর কি খবর?

—দুজন লোক এনেছি। বিশ্বাসী লোক···ফজল আর

হানিফ···আমাদের খুব মানে। এখনো বাপজানকে নবাব-সাহেব বলে ডাকে। ওরা বলছিল, এ-বাড়ীর নীচে বহুৎ টাকা-কড়ি আছে······নবাবী মোহর আছে······জহরৎ আছে।

হেসে জহর বললে—ওরা যদি বার করতে পারে, খুশী করে দেবো···বলো।

কাশেম বললে—গাঁয়ে কুলির কাজ করে। কত অল্পে ওরা খুশী হয়···তুমি তা বুঝবেনা জহর।

—অল্পে যে খুশী হয়···তাকে বেশী দিলে সে খুশী হবে না বলতে চাও ?

—তা নয়। কিন্তু সে হলো পরের কথা···এখন প্ল্যান সম্বন্ধে কিছু ভেবেছো ?

—না। তুমি বলো কাশেম···তোমাকেই করছি গাইড। আমাদের বংশে অনেকে তো সন্ধান করেছেন···কিছু পাননি। এখন তোমার চেষ্টায় দেখা যাক, কি হয়। যদি কিছু থাকে, তোমারি পূর্ব্বপুরুষের দেওয়া···তুমি যদি open sesame বলে' আদায় করতে পারো···ছাখো।

কাশেম বললে—তাহলে এখন চুপচাপ থাকো···তারপর অন্ততঃ দুটো বাজবার পর তখন দুজনে নেমে যাবো।

জহর বললে—কুলিরা ?

—নীচে আছে। খিড়কীর ধারে তোমাদের ঢেঁকিশাল··· সেইখানে শুয়েছে। মহেশদা ওদের কাছে আছে।

—বেশ···এই ব্যবস্থাই রইলো তাহলো।

রাত্রি দুটোর পর···

দুজনে ঘুমোয়নি···নিঃশব্দে নীচে নামলো। খিড়কীর দোরের এদিকে ঢেঁকিশাল।

টর্চ্চের আলো ফেলে জহর ডাকলো,—মহেশদা···

মহেশ সাড়া দিলে,—দাদা!

—তোমরা তৈরী?

—হ্যাঁ, দাদা।

কাশেম ডাকলো—হানিফ···

কুলিদের মধ্যে একজন বললে—জী···

—সেই মশাল দুটো?

—তৈরী আছে।

—আচ্ছা, এখন নয়···পরে জ্বালবো। সঙ্গে নিয়ে এসো। আমরা বেরুই।

জহর আর কাশেম দুজনে···এদিকে মহেশ, হানিফ আর ফজল···খিড়কী খুলে পাঁচজনে নিঃশব্দে সতর্ক পায়ে এলো বাগানে।

এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো! অদূরে কোথায় যেন কারা কথা কইছে···অস্পষ্ট শব্দ কাণে গেল।

কাশেমের গায়ে ঠেলা দিয়ে চুপিচুপি জহর বললে—মানুষের গলা!

কাশেম জবাব দিলে—হুঁ···

—কে ?

—আশ্চর্য্য !

হানিফ বললে—ডানদিক থেকে শব্দ পাচ্ছি। হ্যাঁ,···ডান দিকেই···

জহর বললে,—টর্চের আলো ফেলে আমি যাবো সকলের আগে···তোমরা এসো পর-পর আমার পিছনে।

টর্চ হাতে এগুলো জহর···তার পিছনে কাশেম··· কাশেমের পিছনে হানিফ আর ফজল এবং সকলের পিছনে মহেশ।

বেশী দূর যেতে হলো না···অন্ধকারে প্রায় দশ হাত দূরে গাঁইতির আওয়াজ। সে-আওয়াজ লক্ষ্য করে' জহর ঘোরালো টর্চ···আলো পড়লো আগে···এবং সে আলোয় সকলে দেখে, সেই উমিচাঁদ! তার সঙ্গে আছে দুটো জোয়ান খোট্টা। উমিচাঁদ বুলাকীদের সঙ্গে এ দুজন আজই এসেছে···একজন সেই উমিচাঁদের গোমস্তা-পরিচয়ে, আর-একজন বুলাকীলালের লোক···বলেছিল, মাপের মিস্ত্রী।

কাশেম টক্ করে' জ্বাললো তার দুই মশাল এবং অকস্মাৎ এদের আবির্ভাবে ফতেচাঁদ প্রথমে হলো হতভম্ব···তারপর নিঃশব্দে সরে যাচ্ছিল। হাতের টর্চ কাশেমের হাতে দিয়ে জহর ঝাঁপিয়ে পড়লো ফতেচাঁদের ঘাড়ে, বললে—চোর··· এখানে ফের কি বাঁদরামি হচ্ছে, শুনি ?

বুলাকীর লোক তার গাঁইতি তুলেছিল জহরের মাথায় বসাবে বলে'…কজ্জল তাকে জাপটে ধরে ছুড়ে দিলে…যেন কুস্তি করছে! সে-ধাক্কায় ছিটকে লোকটা গিয়ে পড়লো সেই বলির পাথরে…তার হাত থেকে গাঁইতি ফশকে খশে গেল।

এত চকিতে ঘটনাদুটো ঘটে গেল যে চোখের পলক পড়তেও এর চেয়ে বেশী সময় লাগে!

ফতেচাঁদকে সবলে নাড়া দিয়ে জহর বললে—সাধু মহাত্মা, এখন যদি এখানে তোমায় মাটীর মধ্যে পুঁতে ফেলি?

ফতেচাঁদ কাতর স্বরে বললে—ছোড় দেও ভেইয়া, ছোড় দেও।

—দিচ্ছি ছেড়ে…বলে' জহর ডাকলো—মহেশদা!

মহেশ বললে—দাদা…

—এর মাথার পাগড়িতে বোধ হয় বিশ-গজ কাপড় আছে …পাগড়ি খুলে ব্যাটাকে সেই পাগড়ি জড়িয়ে বেঁধে ফ্যালো ঐ ডুমুর গাছটার সঙ্গে। তার পর কাল সকালে মানী মহাজন উমিচাঁদকে ডেকে তার সামনে ওকে পুলিশের হাতে দেবো।

কথা শুনে তৃতীয় ব্যক্তি সরে পড়লো, যেন আকাশ-ঝরা নক্ষত্র! বুলাকীর লোক উঠে দাঁড়ালো…তার মাথা কেটে রক্ত ঝরছে।

কজ্জল তাকে বললে—দাঁড়া, পালাবার চেষ্টা করলে তোর মাথা দেবো দু'-ফাঁক করে'।

লোকটা ভয়ে চুপচাপ বসে পড়লো।

মহেশ মহাখুশী···ফতেচাঁদকে ছাড়লো না, তখনি হানিফ আর মহেশ দুজনে মিলে টেনে ফতেচাঁদের পাগড়ি খুলে সেই পাগড়ি দিয়ে তাকে ডুমুর গাছের সঙ্গে আচ্ছা করে বেঁধে ফেললে।

বাঁধা হলে কাশেম বললে,—ওরা এইখানটা খুঁড়ছিল··· নিশ্চয় সন্ধান জানে···আমাদের চেয়ে ভালো করে'।

জহর বললে—এইখান থেকেই তাহলে কাজ সুরু করি।

—হুঁ···

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাতাল-গহ্বরে

খুঁড়তে গিয়ে দেখে, জায়গাটা পরিষ্কার অর্থাৎ কতকালের শুকনো পাতা…ঘাস সাফ ! আগাছা…জঙ্গল…নির্ম্মূল ; এবং এ-কাজ সত্ত হয়েছে বলে' মনে হলো না ! দেখলে মনে হয়, দু'-তিন দিন ধরে এ-জায়গা সাফ করার কাজ চলছিল।

কাশেম বললে—আগে থাকতেই এরা লেগে গেছে।

জহর বললে,—হুঁ…তাই বটে চুপিচুপি ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে চোর-ফতেচাঁদ প্রবেশ করেছিল !

ফতেচাঁদ আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা…চেঁচাচ্ছিল না, দুটি কারণে। প্রথম কারণ, জহরলাল যে-রকম সর্ব্বনেশে লোক…চেঁচালে পটপট করে' হয়তো ঠোঁট দুটো সেলাই করে' দেবে ! দ্বিতীয় কারণ, উমিচাঁদ টের পাবে এবং টের পেলে কি জানি…নিজের প্রাণের উপর তার যে-রকম মায়া আর পুলিশকে যে-রকম ভয় করে…নিজের মুক্তির জন্য ছেলেকে ফাঁশিয়ে দিতে তার বাধবে না !

হানিফ আর ফজল কাজে লেগে গেল।

আট-দশ মিনিট গাঁইতি চালাবার পর ঢং করে আওয়াজ। সকলে চমকে উঠলো।

মশালের আলোয় দেখে, প্রায় সাত হাত লম্বা, পাঁচ হাত চওড়া একখানা লোহার পাত।

কাশেম বললে—জানো জহর···হীরাঝিলে নবাব-বাহাদুরের খাশ তোষাখানা ছিল মাটীর নীচে···আর তার মাথায় ছিল এমনি লোহার ঢাকা। সে তোষাখানা লুঠ হয়ে গেছে অবশ্য নবাব বাহাদুর মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে। আর লুঠ করেছিল বড় বড় মানী লোক। কারা, জানো? দেওয়ান রামচাঁদ, মুন্সী নবকৃষ্ণ, ক্লাইভ, ওয়াট্‌স্ আর পাজীর পা-ঝাড়া ব্যাটা মীরজাফর। জানো, হীরাঝিলের তোষাখানা লুঠ করে তারা কি পেয়েছিল? কোটী কোটী টাকার মোহর······ সোনার বাট···গহনা···হীরে-জহরৎ···চুণী-পান্না···ওঃ···একটা সাম্রাজ্য!

জহর বললে—লুঠের বহর জানি···'মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে' ছাপা আছে, পড়েছি। কিন্তু লোহার পাতের কথা তুমি শুনলে কোথা থেকে?

কাশেম বললে—ও গল্প আমাদের বংশে পুরুষানুক্রমে চলে আসছে লোকের মুখে-মুখে···এরাও নিশ্চয় তা শুনে থাকবে। দেশের যারা পুরোনো বাসিন্দা, এ-কথা নিয়ে তারা কত আলোচনা যে করে! তার কতক গল্প হলেও আগাগোড়া বানানো নয় তো। উমিচাঁদের পূর্ব্বপুরুষও তো ঐ সব লুঠ-বাজদের স্যাঙাৎ ছিল।

—হুঁ···এখন?

কজল বললে—লোহার পাতের ধারগুলো খুঁড়ে ফেললে পাতখানাকে ঠেলে সরানো যাবে না ?

কাশেম বললে—চেষ্টা করে দেখা যাক।

আবার চললো গাঁইতি আর শাবল। ওস্তাদের হাতের শাবল···এ্যামেচারী কাজ নয় !

তবু প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগলো। লোহার পাতের একদিকে কখানা কব্জা আঁটা···অন্য তিনদিকে কব্জা নেই। পাতের ঢাকা সরাবা মাত্র মাটীতে মশাল পুঁতে কজনে মিলে টানাটানি ! লোহার পাত নয় তো, জগদ্দল পাথর ! সকলে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল !···দর-দর ধারে ঘাম ঝরছে···নিশ্বাস এত জোরে পড়ছে যে এখনি বুঝি বুকের কপাট ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে ! তবু বিরাম নেই ! বেদম হয়ে দু-চার মিনিট চুপচাপ বসে দম নেয়···আবার সকলে কাজে লাগে !

একটি ঘণ্টা সময় লাগলো···তারপর কজনে টানাটানি করে' পাতখানাকে তুলে ধরলো। কব্জার দিকটা শুধু আঁটা। পাত খুলতে খানিকটা ভ্যাপশা গন্ধ···সে-গন্ধে মাথা ঝিমঝিমিয়ে এলো। নাকে চাপা দিয়ে দু'হাত দূরে সকলে সরে গেল।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে আবার এগিয়ে এলো। মশাল নিয়ে তারি আলোয় ঝুঁকে সকলে দেখে, নীচে চৌবাচ্ছার মতো গহ্বর···তল দেখা যায় না···তার গা বয়ে তিনদিকে সিঁড়ি নেমে গেছে।

জহর বললে—ভিতরে নামি?

কাশেম বললে—না, সকলে নামবে না। এদের এখানে রেখে সকলে নামলে…কি জানি, কখন উপর থেকে এরা লোহার পাত ফেলে বন্ধ করে' দেবে, আর ওর মধ্যে মরে' আমাদের পচে' থাকতে হবে। মণি-রত্ন থাকলেও আমাদের ভোগে আসবে না কিছু।

জহর একটু ভাবলো, তারপর বললে—তাহলে?

কাশেম বললে—আমি বলি, তুমি আর আমি দুজনে নামি …এরা তিনজনে উপরে থাকুক, পাহারা দেবে। আর ধরো, যদি দরকার হয় আমাদের সাহায্য করতে, তখন ওরা নীচে নামবে।

মহেশ বললে—কিন্তু এখনি নামা ঠিক হবে না দাদা… আমি লম্বা কাছি নিয়ে আসি। ক'গাছা মজবুত কাছি কেনা আছে। বাবা বলেছিলেন, আসবাবপত্র যদি গোরুর গাড়ীতে করে' চালান দিতে হয়, বেঁধে নিয়ে যেতে হবে তো…তাই।

—ভালো কথা বলেছো মহেশদা'। তুমি কাছি আনো। যোদ্দা চট্ করে'…সবুর সইবে না।

—না, না, আমি যাবো-আর আসবো।

কাছি আনতে গেল মহেশ…ফতেচাঁদ যেন সিঁটিয়ে আছে! রাসের সময় পুতুলের সং দেখানো হয় মেহদীপুরে…তেমনি সংয়ের মতো তার মূর্ত্তি! চোট-খাওয়া লোকটা চুপচাপ বসে আছে…যেন পাথরের পুতুল!

তাকে উদ্দেশ করে কাশেম বললে,—খারাপ লাগছে বাবুজী?...খোলা হাত, খোলা পা...বলো তো তোমাকেও নাহয় বাঁধি ওদিককার ঐ চাঁপাগাছে!

কাকুতি-ভরে সে যেন গড়িয়ে পড়লো! বললে,—না বাবুজী, না, আমি পালাবো না।

—বেশ। তারপর ফতেচাঁদজী, আছেন কেমন?

ফতেচাঁদ বললে—গায়ে শুঁয়ো পোকা উঠছে।

জহর বললে—সেই জন্যই তো ডুমুর গাছের ব্যবস্থা... ডুমুর-গাছে ভয়ানক শুঁয়ো পোকা হয়...বিশেষ এই শ্রাবণ মাসে বর্ষার জলে। শর-শয্যা!

ফজল বললে—শুঁয়ো লাগলে ভয় নেই বাবুজী, ডুমুরের পাতা গায়ে ঘষলে শুঁয়োর কাঁটা ঝরে যাবে...অব্যর্থ দাওয়াই। পরখ করে দেখতে পারেন। তারপর ব্যবসা করতে পারেন শুঁয়োর দাওয়াই বলে...হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মহেশ ফিরলো তিন-চার বাণ্ডিল দড়ি নিয়ে। বলেছিল, যাবে আর আসবে, সে-কথার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

—এই নাও দাদা, দড়ি।

বাণ্ডিল খুলে লম্বা করে' দু'গাছা পাকিয়ে দুটো বন্ধনীর সৃষ্টি হলো। তারপর...

জহর বললে—আমাদের কোমরে বাঁধা থাক। নামবার সময় এর একটা দিক থাকবে তোমাদের হাতে...সত্যি, কোথাও

যদি ভাঙ্গা ফাটল থাকে, পড়ে' প্রাণদুটো না যায়। মশালের একটা আলো আমরা নিয়ে যাই মহেশদা, আর একটা থাকুক তোমাদের কাছে। আর খুব সাবধান, এদের বিশ্বাস করোনা এতটুকুন্‌...খুব কড়া নজর রেখো। যদি সে ভগ্নদূতটার মুখে খবর পেয়ে উমিচাঁদ আসে, তাকেও আটকাতে হতে পারে জেনো!

—তোমরা তো নামো দাদারা...আমরা তিন-তিনটে প্রাণী রইলুম। দুজন জোয়ান। আর আমি বুড়ো হলেও নবাব বাহাদুরের পাণ্ডাফৌজদারের অন্নে আমরা পাঁচ-সাত পুরুষ মানুষ...গায়ে এখনো যে-জোর আছে, একটি ঘুষিতে বাঘের শক্ত মাথা ফাটাতে পারি গো! ও তো জল-ভস্‌কা উমিচাঁদ দাদা।

আশার উল্লাসে মন সকলের সরস। উৎসাহে শক্তি যেন বহুগুণ বেড়ে উঠেছে!

নীচে নামলো জহর আর কাশেম। সিঁড়ি নেমে গেছে বরাবর...প্রায় দু'-তলার সমান নীচে। এমন গাঁথনি, কোথাও এতটুকু খশেনি, ভাঙ্গেনি।

নীচে উঃ, কি ঠাণ্ডা! প্রশস্ত ঘর। আর ঘরের মেঝেয় লোহার তৈরী বড় বড় বাক্স। চাবি-বন্ধ নেই। ডালা খুললো ...বুক ধবক্‌-ধবক্‌ করছে, হাত-পা কাঁপছে, মাথা টলছে।

ডালা খুলে মশালের আলো ফেলে দেখে, যে কথা

বংশানুক্রমে চলে আসছে, তা গল্প নয়, মিথ্যা নয়, সত্য…সত্য …সত্য !

মোহর…হীরে-জহরৎ…গহনা…কত কি…

মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগলো জহরের। আনন্দ… উত্তেজনা…ক্লান্তি…তার উপর এই শব্দহীন বায়ুহীন পাতাল-পুরী…মনে হচ্ছিল, জীবন বুঝি এখনই শেষ হয়ে যাবে! সমস্ত শরীর অবশ !

হঠাৎ মাথা টলমল্‌ করে উঠলো। একবার শীর্ণ কণ্ঠে জহর ডাকলো,—কাশেম ! তারপর তার দেহ লুটিয়ে পড়লো পাতাল-পুরীর মেঝেয়।

কাশেম কেঁপে উঠলো…উপরের দড়িতে দিলে টান। উপর থেকে তখনি ওরা টেনে তুললো কাশেমকে।

কাশেম বললে—জহর অজ্ঞান হয়ে গেছে! জল চাই… জল…শীগগির।

ফজল বললে—আমরা নীচে নামি…হানিফ আর আমি… সিঁড়ি তো আছে। আমরা ধরাধরি করে' ওঁকে উপরে আনি। উপরে খোলা আকাশ…বাতাস ! মহেশ ভাই, তুমি যাও, জল আনো…পারো, আরো দুচার-জনকে ডেকে আনো। কিন্তু দেরী নয় !

লোকজন জোগাড় করতেও দেরী হলো না। এই বিরাট

পুরীর বহু ঘরে চুণীলালের আশ্রিত বহু লোক বাস করে। কাকেও একটি পয়সা ভাড়া বা খাজনা দিতে হয় না। এদের মধ্যে কেউ করে ঘরামির কাজ, কেউ মাঝি, কেউ মিস্ত্রী, কেউ বা কুলি।

মহেশ নিয়ে এলো জল। কলসী ভরা। ফজল আর হানিফ স্বচ্ছন্দ ভাবেই জহরকে তুলে আনলো উপরে। জল···বাতাস ······সেবা···জহর অচিরে চোখ মেলে চাইলো···প্রকৃতিস্থ হলো!

কাশেম বললে—এখানে পাহারা দরকার। লোহার পাত এখন বন্ধ থাকুক···আর আজকের রাতটুকু এরা করুক কড়া চৌকিদারী···মহেশ, ফজল আর হানিফ। দরকার হয়, আরো দু-চারজন!

এ পরামর্শ হলো জনান্তিকে···ফতেচাঁদ না জানতে পারে, তাকে বাঁচিয়ে।

ভিতরকার খবর কেউ জানলো না জহর আর কাশেম ছাড়া।

মহেশ বললে—হঠাৎ এমন হলো কেন?

কাশেম বললে—ভিতরে কত বছরের ভ্যাপসানি হাওয়া··· বিষিয়ে ছিল যেন! সহ্য হবে কেন?

মহেশ বললে—ভাগ্যে তোমারো অমন হয়নি···দুজনে অজ্ঞান হলে ফ্যাসাদের সীমা থাকতো না!

—নিশ্চয়।

মহেশ প্রশ্ন করলে—কিন্তু ভিতরে কিছু দেখলে?

কাশেম বললে—দেখলুম বৈ কি। দুশো বছরের জমাট অন্ধকার!

—কিছু নেই? অত যে গল্প···

—কিছু না মহেশদা। সাপখোপ যে ছিল না, আমাদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি।···তবু রাতটুকু পাহারা রাখা দরকার। দিনের বেলায় আবার আমরা সন্ধান করবো···তোষাখানা যখন পাওয়া গেছে, তখন তোষা যদি মেলে! কি বলো?

উৎসাহ-ভরে মহেশ বললে—নিশ্চয়!

রাত্রে কাক-পক্ষীও কিছু জানলো না। ফতেচাঁদকে মুক্তি দিয়ে জহর বললে—দুবার হাত ফশকে গেছো ফতেচাঁদবাবু··· কথায় বলে, বার-বার তিন বার! ফের যদি চোরা-গোপ্তা কাজে তোমাকে এখানে দেখি, তাহলে তোমার দফা রফা করে' দেবো, তোমার ভোঁদা বাবা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আর তার জন্য জেলে যেতে হয়, যাবো···ফাঁশি যেতে হয়, তাতেও আমি পেছপা হবো না।

ছাড়া পেয়ে নিশ্বাস ফেলে ফতেচাঁদ বললে—আবার! এই কাণ মলছি···নাক মলছি। সত্যি বলছি, সকাল হলেই এখান

থেকে আমি চলে যাবো···তারপর বাড়ীর দখল পাবার আগে ফের যদি আমাকে এ-বাড়ীর সীমানায় তোমরা ছাখো, তাহলে আমাকে জুতো মেরো···গুণে দুশো ঘা জুতো!

জহর বললে,—তোমাদের মতো তালিমারা নাগরা পায়ে দেওয়া তো অভ্যাস নেই। জুতো মারবো না! আমাদের হাল্‌কা জুতো ছিঁড়ে যেতে পারে। মাথায় দেবো শাবলের ঘা ···বুঝলে?

ফতেচাঁদ বললে—বেশ······তাই······তাই! শাবলের ঘাই!

জহর বললে—হুঁ, তাহলে বুঝেছো দেখছি। এ জ্ঞানটুকু আগে হলে আজকের দিনে দু-দুবার এমন নাস্তানাবুদ হতে হতো না ফতেচাঁদবাবু।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো। কাশেম আর জহর এলো দোতলার ঘরে।

কাশেম বললে—চাচাজী কিছু জানতে পারেন নি··· আশ্চর্য্য!

জহর বললে—হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য এখন?

কাশেম বললে—চাচাজীকে আড়ালে ডেকে সব কথা বলতে চাই, ও-ব্যাটারা না আঁচ পায়। পেলে আর কিছু নয়···একটা চ্যাঁচামেচি করবে। সেটা ঠিক হবে না।

জহর বললে—আমার মাথায় কিছু আসছে না ভাই কাশেম

…তুমি করো, এখন কি করা উচিত! আমার এখনো মনে হচ্ছে, যেন স্বপ্ন দেখেছি!

কাশেম বললে—সত্যি, এত সহজে সন্ধান পাবো, ভাবিনি!

জহর বললে—আমাদের সন্ধানের কাজটুকু ফতেচাঁদ সেরে রেখেছিল। জানো, একটা কথা চলিত আছে, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়!

কাশেম বললে—চাচাজীর চেহারা যা হয়ে গেছে… দুর্ভাবনায়, ওঃ! আমাদের বাড়ী নেই, ঘর নেই…ছোট্ট কুঁড়ে তবু তার উপর কত মায়া! সে কুঁড়ে তবু পূর্ব্বপুরুষের নয়… সুখের দিনের কোনো স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িয়ে নেই! আর এ-মঞ্জিল…

জহর কি ভাবছিল, একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—সব ঠিক কাশেম…নীচে যা দেখে এলুম, ও তো চট্ করে' তোলা যাবে না। খোলা জায়গা…সম্পূর্ণ অরক্ষিত…তার উপর এখানে বুকে চেপে বসেছে ঐ বাঁটুল মর্কট তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। নিঃশব্দে ও-সবের উদ্ধার হবে কি করে'?

কাশেম বললে—আমি কি এ-সব ভাবছি না, ভাবো? ভেবেছি। আমি ঠিক করেছি, সকাল হলে বাপজন্‌কে চুপি-চুপি এ খবর গিয়ে জানাই। তারপর তাঁর সঙ্গে শলা-যুক্তি করে'…

বাধা দিয়ে জহর বললে—কিন্তু তার আগে এ ব্যাটাদের তাড়ানো দরকার, কাশেম।

কাশেম বললে—সে-কথাও ভেবেছি, আর তার উপায় বাপজান বোধ হয় করে দিতে পারবেন।

জহর বললে—আমার মাথায় কিছু আসছে না। যা করবার, তুমিই করো। কিছু ভাবতে গেলে আমার মাথা কেমন ঝিমিয়ে আসছে! এমন ঘুম পাচ্ছে যে…

কাশেম বললে—বেশ, ঘুমিয়ে নাও। আমি ঘুমোবো না… আমার ঘুম পায়নি। আকাশের দিকে চেয়ে আমি বসে থাকি, সূয্যি-ঠাকুর কখন এসে দেখা দেন!

নবম পরিচ্ছেদ

ভাগ্যচক্র

ভোরের আলো ফোটবা মাত্র জহরকে ডেকে তুললো কাশেম।

জহর উঠলে দুজনে এলো চুণীলালের ঘরের দোরে।

জহর ডাকলো—বাবা···

চুণীলাল জবাব দিলেন। বললেন—জহর···এসো!

দুজনে ঘরে ঢুকলো। চুণীলাল শুয়ে আছেন···উস্কো-খুস্কো মূর্ত্তি। দেখেই বুঝলো, রাত্রে উনি ঘুমোননি।

কাশেম বললে—ঘুমোননি চাচাজী?

সনিশ্বাসে চুণীলাল বললেন—না বাবা, এক-মিনিটের জন্য চোখ বুজতে পারিনি···সারা রাত মাথার মধ্যে যেন লক্ষ লক্ষ বিছে কামড়েছে!

চারিদিকে চেয়ে কাশেম বললে—সব দুর্গতি কেটেছে চাচাজী! কাল রাত্রে আমরা তোষাখানার সন্ধান পেয়েছি। আর কেউ জানে না। মহেশদাও নয়। জানি শুধু আমি আর জানে জহর।

—কি বলছো কাশেম?

—হ্যাঁ চাচাজী, সব কথা বলছি···শুনুন।

কাশেম সব কথা খুলে বললো। শুনে চুণীলালের মনে হলো, পৃথিবী যেন ভূমিকম্পের বেগে দুলছে…তাঁর সর্ব্ব শরীর যেন সে-দোলায় দুলছে…দুলছে…

কাশেম বললে—কথাটা প্রকাশ করবেন না। সেখানে মহেশদাদের আর আপনার বাড়ীতে যারা থাকে, তাদের ক'জনকে পাহারায় রেখে এসেছি। ওরা জানে, আজ আমরা ভিতরে নেমে তল্লাস করবো। এই পর্য্যন্তই এখন শুনে রাখুন। তার পর আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি…বাপজানকে ডেকে আনি। কাছারিতে চাপরাশির কাজ করলেও আইন-কানুনের কথা জানেন। হাকিম-পুলিশের কাছেও কিছু ওঁর খাতির আছে তো।

—বেশ বাবা, তাই তুমি করো। রহিমকে ডেকে আনো। সে যা বলবে, শোনো। আমার মাথায় কিছু আসছে না।

কাশেম বললে—কিন্তু আপনাকে একটি কাজ করতে হবে চাচাজী।

চুণীলাল বললেন,—বলো, কি করতে হবে ?

কাশেম বললে—আমাদের কিছু করবার আগে ঐ উমি-চাঁদদের দলটিকে বিদেয় করে দেওয়া চাই। ওরা এখানে থাকতে কিছু করা হবে না।

—কিন্তু দলিলে যে লেখা সই করে' দিয়েছি…

—ভাববেন না। বাপজান আসুন…তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে' ব্যবস্থা করুন। এ-কাজটি করতেই হবে চাচাজী।

এ-কথা বলে কাশেম ছুটলো রহিমের কাছে এবং রহিমকে সব খবর জানাবামাত্র রহিম ছুটে এলো।

পরামর্শ হলো। রহিম বললে—এখন চুপচাপ থাকতে হবে। মহেশকে আর ওদের বলো, আয়োজন করে' তবে ওর মধ্যে নেমে সন্ধান করতে হবে···না হলে ওর মধ্যে যে বিষাক্ত গ্যাস আছে, সে-গ্যাসে মারা যাওয়া বিচিত্র নয়। জহর তো সত্যই অজ্ঞান হয়ে গেছলো, ওরা তা চোখে দেখেছে।

চুণীলাল বললেন—কিন্তু এদের তাড়ানো?

রহিম বললে—সে-ভার আমায় দেবে?

—নিশ্চয় দেবো।

—তা হলে ছাখো, কি করি।

ঘুম ভাঙ্গবার পর একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে উমিচাঁদ করছিল দাঁতন···হাঁ করে' কত-রকম যে আওয়াজ···কত-রকম কশরতি···

রহিম এসে বললে—সেলাম শেঠজী!

রহিমকে উমিচাঁদ জানে। সদরের বড় ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের খাশ-চাপরাশি···সাহেব তার হাতে। উমিচাঁদকে নানা কাজে কাছারিতে যেতে হয়···উকিল ধরতে গেলে প্রতি-হাতে ফী দিতে হয়···তার চেয়ে রহিম মিয়ার হাতে

আট আনা, বড় জোর একটা টাকা দিয়ে কতবার সে শস্তায় কত কাজ করিয়ে নেছে।

রহিমকে দেখে দাঁতন নামিয়ে উমিচাঁদ বললে—আরে, বড় মিয়া যে! সেলাম···সেলাম।

চারিদিকে চেয়ে একটু সতর্ক ভাব দেখিয়ে রহিম বললে—আপনার দখল পেলেন বুঝি কাল?

উমিচাঁদ বললে—পাইনি। পাঁচ দিন এখনো বাকী আছে দখল পাবার···দলিলে এমনি লেখা!

রহিম শুধু বললে,—ও···

এ-কথা বলে' রহিম চোখের যে ভঙ্গী করলো···যেন কত-খানি আতঙ্ক! সে-দৃষ্টি দেখে উমিচাঁদ চমকে উঠলো।

রহিম বললে—তাহলে তো ভালো কথা নয়, শেঠজী!

—কেন? কেন? কি আবার হলো বড় মিয়া?

—জানেন তো ঐ চুণীলালবাবুর ছেলে···কলকাতার কলেজে পড়েন উনি···আইন-কানুনের কথা জানেন। কাল আমার সঙ্গে দেখা করে' বলে এসেছেন, একজন উকিল ঠিক করে দিতে। আমি বল্লুম, কেন? তাতে বললেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত দেবেন···এত আগে থাকতে আপনি এসে বাড়ী চেপে বসেন কোন্ আইনে? মানে, নালিশ করবেন উনি।

—নালিশ!···চোখ বড়-বড় করে উমিচাঁদ বললে—বাড়ী-ঘর দেখে নেবো না, দখলের আগে? বাঃ!

মৃদু হাস্যে রহিম বললে—তা কি আপনি পারেন শেঠজী ?

—দলিলে তাই লেখা আছে।

রহিম বললে—দলিলে অনেক কথা অমন লেখা থাকে··· তার সবগুলো কি আইনে টেঁকে ?

—তাহলে ?

—আমি ওঁকে মানা করেছি। বলেছি, শেঠজী ভালো আদমী···অত-শত বোঝেননি···দোস্তি আছে···সেই খাতিরে এসেছেন। তাতে বললে, বাবার সঙ্গে ওঁর দোস্তি আমি মানবো না। তাই বলছিলুম শেঠজী, পাঁচ দিন পরে এলেই ইজ্জৎ থাকে তো ! তার উপর আপনার লেড়কা না কি বাগানে ঢুকে কাল রাত্রে কি সব লোকশান-ফোকশান দাঙ্গা-ফ্যাশাদ করেছে।

শুনে উমিচাঁদের মুখ একেবারে এতটুকু !

রহিম বললে—আমি বলি, কেন আর এই পাঁচটা দিনের জন্য ফ্যাশাদ বাধানো ! আপনি বরং আজ এখন চলে যান, পাঁচ দিন বৈ নয়···তারপর পাঁচ দিন বাদে এসে দখল পেয়ে টুঁটি চেপে হিসেব বুঝে নেবেন।

উমিচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করলো···কি ভাবলো। তারপর একটা মস্ত নিশ্বাস ফেলে শুধু বললে—বেশ···তুমি আইন-কানুন জানো···কাছারিতে থাকো···তুমি যখন বলছো···

এবং তারপর ঘণ্টাখানেকও কাটলো না···উমিচাঁদ সদলে

বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। ফতেচাঁদ কি বলতে যাচ্ছিল, উমিচাঁদ তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে···বললে—চ্-চ্-চ্-উপ ···র্-র্-র্-অহো উল্লু···

জহর বললে—কি করে তাড়ালেন, চাচাজী?

হেসে রহিম বললে—আরে বাপজান, কম মাইনের চাকরি হলে কি হবে, বড় ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের চাপরাশি, তার খাতির···এদের কাছে নবাব-বাদশার চেয়ে অনেক বেশী। বলে, ছোট-ছোট হাকিমরা পর্য্যন্ত আমাদের কত খাতির করে। বাবা-বাছা বলে কথা কয়। ওকে ভয় দেখালুম···বললুম, জহর যাবে উকিলের কাছে···

বিদায়-তত্ত্ব রহিম বুঝিয়ে দিলে।

চুণীলাল বললেন—এখন শেষ রক্ষা করো রহিম।

—কেন ভাবছো চুণীবাবু? শোনো বলি, কেউ জানবে না, এমনভাবে মোহর তুলে আনো। দিনের বেলায় কাশেম আর জহর দুজনে শুধু তার ব্যবস্থা করুক···মহেশও জানবে না। কি জানি, আহ্লাদের চোটে যদি বেফাঁশ কিছু বলে বসে কারো কাছে! পুলিশ জানতে পারলে এখনি থাবা উঁচিয়ে আসবে। খুব হুঁশিয়ার! সেই মোহর আর গহনাগাঁটী নিয়ে জহর আর কাশেম আমার সঙ্গে সদরে চলুক। বহুৎ পোদ্দার আছে···কিছু বেচে ওর টাকাটা জোগাড় করে' চুকিয়ে দাও। টাকা দিলেই ওর দায়ে খালাশ হবে। তোমার বাড়ী···তোমার

জমি···তোমার ইজ্জৎ···সব বজায় থাকবে! ওর দেনা আগে শোধ হোক, তুমি নিশ্চিন্ত হও, তার পর গভীর রাত্রে বিশ্বাসী দু-চারজন মাত্র লোক নিয়ে সব-কিছু তোলোগে যাও। তোলা চাইই। সব তোলা হলে দাও ঐ লোহার পাতের উপর একটা থাম্বা গেঁথে···ব্যস্!

এই পরামর্শ-মতই কাজ হলো। সেই দিনই কখানা সোনার বাট বেচে পোদ্দারদের কাছ থেকে পাওয়া গেল প্রায় সতেরো হাজার টাকা।

যেমন পাওয়া······রহিমের সঙ্গে জহর গিয়ে উঠলো উমিচাঁদের ওখানে।

উমিচাঁদ বললে—কি খবর বড় মিয়া?

রহিম বলবে—আপনার পাওনা পনেরো হাজার টাকা জহর দিতে এসেছে। চুণীবাবুর দেনার টাকা। আমায় ধরে নিয়ে এলো, ছাড়লো না! বললে, সাক্ষী হতে হবে রহিমচাচা।

উমিচাঁদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো! সব গেল ফশ্‌কে···ভো-কাট্টা···যাঃ! কি এমন ফুশ্‌ মন্তর···

ঢোক গিলে উমিচাঁদ বললে—এত টাকা কোথা থেকে এলো জহরবাবু?

—ধার করলুম।

—ধার! কত সুদে?

—তা সুদ একটু বেশী রকমই দিতে হবে···শতকরা আট টাকা। সে সুদ দেবো বলবামাত্র ঝড়াক্সে টাকা পেলুম!

—কিন্তু লোকটা কে? এ-মুল্লুকে এক কথায় ঝাঁ করে এত টাকা···?

হেসে জহর বললে—নামটা সে বলতে মানা করে দেছে উমিচাঁদবাবু! তবে আপনি যদি কিছু ধার চান···বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা···আমায় বললে এনে দিতে পারবো!

নিশ্বাস ফেললে উমিচাঁদ বললে,—হুঁ! কিন্তু এত সুদে টাকা ধার করলে, এ ধার শোধ করবে কি করে'? তার চেয়ে আমায় বললে, বাড়ীর দখল যখন ছেড়ে দিচ্ছ, আমি না কোন্ দুশো-পাঁচশো টাকা আরো দিতুম! দোস্ত মানুষ!

জহর বললে—কিন্তু দুশো-পাঁচশোর ঢের বেশী পাচ্ছি এখানে কি না!

—তার মানে?

—মানে, বন্ধক দিয়ে আপনার দায় খালাশ করে' ভিটে-মাটী বেচে দেবো···নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দর পাচ্ছি। এক সাহেব-কোম্পানি জমি-বাড়ী সব কিনে ওখানে কাপড়ের কল খুলবে। বরাত জোর বলতে হবে···নয় উমিচাঁদবাবু?

—ব্-ব্-ব্-ওহুৎ···ব্-ব্-ব্-ওহুৎ···ব্-ব্-ব্-ওহুৎ···

নিরুপায়! উমিচাঁদের গা জ্বালা করতে লাগলো রাগে। নাঃ, লেখাপড়া-জানা ছেলেগুলোর জ্বালায় ব্যবসা আর চলবে না! তলে-তলে এত শয়তানী!

বাড়ী বাঁচলো······সম্পত্তি রক্ষা পেলো। সঙ্গে-সঙ্গে তোষাখানা থেকে···

তবু গল্পে কুবেরের যত ঐশ্বর্য্য শোনা গিয়েছিল, তত নয়। যা পাওয়া গেল, তার জোরে বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবসা করতে পারলে···লক্ষপতি!

কত কি পাওয়া গেল, সে খবর জানলো শুধু পাঁচজন··· চুণীলাল, জহর, মহেশ, রহিম আর কাশেম।

রহিমকে চুণীলাল ছাড়লেন না···বললেন—তোমারি পূর্ব্ব-পুরুষের টাকায় আমরা ধনী···এ-টাকা তোমার পূর্ব্বপুরুষের··· আমি একা নিলে ভোগ হবে না রহিম।

রহিম কিছুতে নেবে না···বলে—খোদা তোমায় দেছেন চুণীলালবাবু।···তোমার সম্পত্তি!

চুণীলাল বললেন—বেশ···কাশেমের তো চাচাজী আমি··· কাশেমকে আমি দেবো। আমার দেওয়ায় সে "না" বলতে পারবে না। এ-টাকায় তোমার কুঁড়ে ভেঙ্গে পাকা ইমারত ওঠাও আগে আর কাশেম লেখাপড়া শিখুক···লেখাপড়া শিখে সে করবে ব্যবসা। কাশেম আর জহর দুজনকে তো আমি ভিন্ন চোখে' দেখি না রহিম ভাই!

রহিমের দু' চোখে জল···চুণীলালকে বুকে জড়িয়ে রহিম বললে—তুমি আমার ভাই, সত্যিকারের ভাই, চুণীলালবাবু!

প্রহেলিকা-সিরিজ

এ্যাডভেঞ্চার ও ভয়াবহ কাহিনী-পরিপূর্ণ শিশু-উপন্যাস

প্রত্যেকখানি—এক টাকা

১। মুখোশের অন্তরালে
২। মৃত্যুদূত
৩। ব্লাড্ হাউণ্ড
৪। কালের কবলে
৫। শেষ বলি
৬। নৈশ অভিযান
৭। কবরের নীচে
৮। জীবনের মেয়াদ
৯। অস্তাচলের পথে
১০। শেষ নিশ্বাস
১১। দরদী বন্ধু
১২। রাতের অতিথি
১৩। মিঃ গশ্ ডিটেক্‌টিভ্
১৪। কাল-বৈশাখীর ঝড়
১৫। স্বদেশের ডাক
১৬। রাত যখন সাতটা
১৭। ঝড়ের প্রদীপ
১৮। ডাকাত কালীর জঙ্গলে
১৯। স্বপ্ন হলো সত্যি
২০। অদৃশ্য গোয়েন্দা
২১। গ্রহের ফের
২২। রক্ত-তৃষা
২৩। হাওয়ার পেছনে
২৪। নকলের হিমালয়
২৫। বি, এল, এ—২০৫
২৬। জয়-পরাজয়
২৭। পূজনীয় দস্যু
২৮। দুর্য্যোগের রাতে
২৯। সবই যখন অন্ধকার
৩০। কলঙ্কী চাঁদ
৩১। বর্ম্মা ফেরত
৩২। সোনার খনি

দেব সাহিত্য-কুটীর : ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা